দুর্বার ভাবনা

বর্ষ : ৫ সংখ্যা : ২ □ জুন ২০১৩

সূ চি প ত্র

স ম্পা দ কী য় ... 'শত ফুল বিকশিত হোক'... স্মরজিৎ জানা...১
প্র তি বে দ ন : এ ক টি স ৎ প্র য়া স :একজন শিক্ষক ও একটি সৎ প্রয়াস... ৪
প্র চ্ছ দ নি ব ন্ধ : ছা ত্র আ ন্দো ল ন
গুণ্ডাদের গুণ্ডামির দায় বর্তাবে ছাত্রদের উপর ...অসীম চট্টোপাধ্যায়... ৫
বি শে ষ নি ব ন্ধ : ন দী
শুকিয়ে যাচ্ছে নদী ... কল্যাণ রুদ্র... ৭
বি শে ষ নি ব ন্ধ : জ ল
এত নিশ্চিন্তে ভূগর্ভস্থ জল তোলা যাবে না ...ধ্রুবজ্যোতি ঘোষ... ৯
বি শে ষ নি ব ন্ধ : চি ট ফা ন্ড
সহজ মানুষ, সভ্য মানুষ ও চিট ফান্ড...ব্রতীন চট্টোপাধ্যায়... ১১
বি শে ষ নি ব ন্ধ : প শ্চি ম ব ঙ্গে র অ র্থ নী তি
পশ্চিমবঙ্গে শিল্প : স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণা ... সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়... ১৩
সা ক্ষা ৎ কা র : প্র স ঙ্গ রা জা র হা ট বৃ ত্তা ন্ত
তথ্য, আখ্যান, প্রবন্ধের কোলাজ : *অপারেশান রাজারহাট*
লেখক রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তরুণ বসু-র দীর্ঘ কথোপকথনে ... ১৭
বি শে ষ নি ব ন্ধ : দৈ ন ন্দি ন বি জ্ঞা ন
ফ্রিজের খাবার কত নিরাপদ ... স্মরজিৎ জানা... ২৭
অ সু খ - বি সু খ রো গ - বা লা ই
জলাতংক : যে রোগে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী ...পুণ্যব্রত গুণ... ২৮
ব ই প ড়া র ক থা / প ড়া ব ই - এ র ক থা
উচ্ছেদ আখ্যান : রাজারহাট ... অভিজিৎ গুহ ... ৩১

ছ বি ঋ ণ স্বী কা র : কল্যাণ রুদ্র এবং গুগলস ওয়েবসাইট।
প্র চ্ছ দ : তরুণ বসু

মু দ্র ণ : রে'জ ডট কম, ৪৪/১, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯

DURBAR BHABNA
New Declaration No 1/12 & 2/12 as on 2. 1. 2012
Vol. 5 No.2 □ June 2013
Editor : Dr Smarajit Jana
Publisher : Bharati Dey
Address : 12/5 Nilmani Mitra Street, Kolkata 700 006 WB INDIA
Phone : 033 2543 7560/7451 Fax : 033 2543 7777 e mail : sonagachi @sify.com URL : www.durbar.org

স ম্পা দ কী য়

'শত ফুল বিকশিত হোক'

এ রাজ্যে মাঝে মাঝেই একটা রব ওঠে যে ছাত্রদের রাজনীতি করা উচিত নয়। কখনও হয়তো সরাসরি ঘোষণা করা হয় কখনও বা সেটা প্রশ্নের আকারে ছুড়ে দেওয়া হয়। যেমন 'ছাত্রদের কি রাজনীতি করা উচিত'? এরপর এই প্রশ্নের পক্ষের আর বিপক্ষের যুক্তিগুলো খাড়া করে একটা বিতর্ক শুরু করা হয়। পত্রপত্রিকা রেডিও টিভি এসব নিয়ে বেশ কিছুদিন সরগরম থাকে, মন্ত্রী থেকে শুরু করে জ্ঞানীগুণী-জনেরা তখন এ নিয়ে তাদের মতামত বিস্তার করেন। একটু খোঁজ করলে দেখা যাবে, স্কুল-কলেজ চত্বরে কোনো বড়োমাপের সংঘর্ষ, হানাহানি ঘটার প্রেক্ষিতে ছাত্রদের রাজনীতি করার বিষয়টি মাঝে মাঝেই আলোচনায় গুরুত্ব পেয়ে থাকে। সম্প্রতি এ রাজ্যে বিগত কয়েক মাস জুড়ে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বেশ কিছু অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটার ফলশ্রুতিতে ছাত্র রাজনীতির বিষয়টি আবার নতুন করে বিতর্কের আসরে উঠে এসেছে।

প্রথমেই বলে নেওয়া ভালো, ছাত্রদের রাজনীতি করা না করার আলোচনা, সমালোচনা ইত্যাদি কার্যত একটি রাজনৈতিক বির্তকের বিষয়বস্তু। যারা এর পক্ষে রয়েছেন তারা এক ধরণের রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের বক্তব্য রাখেন। যারা ছাত্রদের রাজনীতি করার বিরোধী তারাও তাদের রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণার থেকে যুক্তি সাজান। এখানে রাজনীতি বলতে আক্ষরিক অর্থে রাজনীতির কথাই বলা হচ্ছে, সংকীর্ণ ভাবে দল বা পার্টিবাজির জায়গা থেকে বিষয়টা দেখা হচ্ছে না। এই প্রসঙ্গে দ্বিতীয় যে প্রশ্নটা উঠে আসে তা হলো, যা নিয়ে এত সব তর্ক-বিতর্ক, অর্থাৎ রাজনীতি করা না করা, সতিই কি তার এক্তিয়ার বেঁধে দেওয়ার কোনো নৈতিক এমনকি আইনি অধিকার কলেজ কর্তৃপক্ষ, মন্ত্রী, প্রশাসন ইত্যাদির রয়েছে? আমাদের

দেশের সংবিধান অনুযায়ী আঠারো বছর বয়েস থেকে সবাই কার্যত সাবালক এবং পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি হিসেবে এদেশের নাগরিক। তাদের সকলেরই নাগরিক হিসেবে ভোটদানের অধিকার রয়েছে। এমনকি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে রাষ্ট্র পরিচালনার জায়গায় তারা পৌঁছুতে পারেন। পারেন রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী হতে। আমরা যে সব কলেজ পড়ুয়াদের রাজনীতি করা না করার কথা বলছি তারা প্রায় সবাই আঠারো বছরের উর্ধ্বে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে এই সব ছাত্রছাত্রীরা রাজনীতি করবেন, নাকি করবেন না, তা নিয়ে তৃতীয় কোনো পক্ষের থেকে নির্দেশ বা ফতোয়া জারি কোন্ যুক্তিতে মেনে নেওয়া যাবে?

তৃতীয় যে বিষয়টা আলোচনায় আসা দরকার তা হলো 'ছাত্র রাজনীতি' বলতে সত্যিই কি বোঝানো হচ্ছে? কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ইউনিয়নের যে কিছু সুনির্দিষ্ট ভূমিকা নির্ধারিত রয়েছে— আমরা কি শুধু সেই বিষয়টাতে আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখছি নাকি সামগ্রিক ভাবে ছাত্র সমাজ যে ভাবে দেশ এবং দেশকালের সীমারেখা ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন বিষয়ে এবং বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাকে কেন্দ্র করে সরব হয়ে ওঠে, এসব নিয়ে তাদের মধ্যে যে আলোড়নের জন্ম হয় সেই বিষয়গুলোকেও গুরুত্বের জায়গায় রাখছি। কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌহদ্দিতে নির্বাচনের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীরা তাদের মনোনীত প্রার্থীদের জয়ী করে কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইউনিয়ন গঠন করে, তাদেরকে ইউনিয়ন পরিচালনার জায়গায় বসায়। এই ইউনিয়নগুলি ওই প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন, পঠন-পাঠন, ছাত্রছাত্রী ভর্তি সহ বিভিন্ন বিষয়ে কিছু ভূমিকা রাখার জায়গায় রয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা, মতামত বিনিময়ের মাধ্যমে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ এবং ছাত্র ইউনিয়ন যৌথ ভাবে নিয়ে থাকে। ছাত্র ইউনিয়নগুলির ভূমিকা কিন্তু এর থেকে বেশি কিছু নয়। এটা ঠিকই, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ইউনিয়ন গড়ে তোলার পেছনে একটি দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করে। এই দৃষ্টিভঙ্গির জায়গাটা হলো গণতান্ত্রিক রীতিনীতিকে মান্য করা এবং ছাত্রদের দ্বারা নির্বাচিত ও গঠিত ইউনিয়নকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কিছু কিছু ম্যানেজমেন্ট সংক্রান্ত বিষয়ে যুক্ত রাখা। ছাত্র নেতারা এর মাধ্যমে ওই প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীদের মুখপাত্র হয়ে তাদের সুবিধা-অসুবিধার বিষয়গুলো কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছে দেয় এবং সুবিচারের বিধি-ব্যবস্থাকে দৃঢ় করার চেষ্টা করে।

কৈশোর পেরিয়ে যৌবনে পা দেওয়া এই সব পড়ুয়ারা হচ্ছেন সমাজের সব থেকে সংবেদনশীল অংশ। সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ তাদেরকে সব থেকে বেশি আলোড়িত করে। এই বয়েসের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে মনের প্রসারতা, চিন্তার বিশালতা ব্যক্তিস্বার্থকে গুরুত্ব না দেওয়া, দেশের আপামর জনসাধারণের প্রতি ভালোবাসা ও দায়বদ্ধতার বিষয়গুলো অনেক গভীর ভাবে দেখা যায়। এই বয়েসের ছাত্রছাত্রীদের এটি একটি বিশেষ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হিসেবে দেখা হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন কর্মকাণ্ডকে ঘিরে তারা প্রশ্ন তোলে, প্রয়োজনে তার বিরুদ্ধচারণ করার প্রবণতা এদের মধ্যে রয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের মানসিক কাঠামো ও দেশপ্রেমী দৃষ্টিভঙ্গি তথা সাহসী মনোভাব তাদেরকে দেশ এবং আন্তর্জাতিক স্তরের বিভিন্ন উন্নয়ন ও পরিবর্তনের আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করে। সে কারণে যে কোনো দেশেই যুব সমাজের একটি বিশিষ্ট গুরুত্ব ও ভূমিকা রয়েছে। শিক্ষার আঙিনায় থাকার সুবাদে ছাত্রছাত্রীরা অনেক দূরের জিনিসকে ঘরের কাছের মনে করে এবং তা অপরকে দেখতে ও দেখাতে সাহায্য করে। বদলে দেবার এবং বদলে নেবার কথা তারা ভাবতে পারে কিংবা ভাবানোর স্পর্দ্ধা দেখাতে পারে। বৃহত্তর সমাজ যা সামাজিক এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনার অন্তর্বস্তুকে সামনে তুলে আনতে এবং প্রয়োজনে সেগুলোকে সংশোধন ও বদলানোর দাবির কাজটি মুখ্যত ছাত্র সমাজই প্রথম করে থাকে।

ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে বহু দেশে রাজনৈতিক পরিবর্তনের পটভূমি তৈরি করেছে সে দেশের ছাত্র আন্দোলন। বহু দেশে সামাজিক তথা রাজনৈতিক পালাবদলের বহু আন্দোলনে ছাত্রসমাজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলন— যার মুখ্য ভূমিকায় ছিল কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা। সে দেশে মাতৃভাষা আন্দোলন যত শক্তিশালী হয়েছে ততই সে দেশের রাজনৈতিক ক্ষমতা বদলের রাস্তা সচল হয়েছে, দেশজুড়ে আন্দোলন বিস্তৃত হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হিসেবে গড়ে উঠেছে। স্বাধীন দেশ হিসেবে বাংলাদেশ গড়ে ওঠার পটভূমি তৈরি করেছিল ছাত্রসমাজ এবং এই ভাষা আন্দোলন। সেই দেশে এই মুহূর্তে যে শাহবাগ আন্দোলন দানা বাঁধছে মৌলবাদের বিরুদ্ধে তারও পিছনে রয়েছে বাংলাদেশের বিশাল সংখ্যক ছাত্রছাত্রী। তারাই প্রকাশ্য রাজপথে এই আন্দোলনে সামিল হয়েছে। আমাদের এই রাজ্যে বিভিন্ন সময়ে খাদ্য আন্দোলন, ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধির বিরুদ্ধে যারা প্রতিবাদে সামিল হয়েছিলেন তাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো এই ছাত্র সমাজ। ষাটের দশকে পৃথিবী জোড়া পরিবর্তনের হাওয়া বয়ে এনেছিল ইউরোপের ছাত্র আন্দোলন। সমাজ পরিবর্তনের ঢেউয়ে ভেসে গিয়েছিল বহুদেশের ছাত্র-যুব সমাজ। সে-সময়ে এ দেশের গরিব সাধারণ মানুষের জীবনে পরিবর্তন আনার লড়াইতে এ রাজ্যের বহু ছাত্রছাত্রী প্রাণ দিয়েছিল। সমাজ পরিবর্তনের যে লড়াই দানা বেঁধেছিল নকশালবাদী আন্দোলনের মাধ্যমে সে-ও শুরু হয়েছিল ছাত্র আন্দোলনকে ভিত্তি করে।

লাতিন আমেরিকার ছাত্র আন্দোলনের বিশালতা ও গভীরতা শুধু সে দেশে নয়, পৃথিবীর বহু দেশে পরিবর্তনের বার্তা বয়ে এনেছিল। তাই কোনোভাবেই ছাত্র আন্দোলনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার বিষয়টা খাটো করা যায় না। সেই জায়গা থেকে বিচার করলে ছাত্রদের রাজনীতির আঙিনা থেকে সরিয়ে রাখার কোনো যুক্তিকেই সমর্থন করা যায় না। এছাড়া অন্য যে বিষয়টা আলোচনায় আসা দরকার তা হলো বর্তমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ঘটে যাওয়া সমস্যাগুলোর প্রেক্ষাপট খুঁজে দেখা। বোঝা দরকার আসলে বর্তমান সমস্যাটা কি ছাত্র রাজনীতিকে ঘিরে না অন্য কিছু? ছাত্রদের রাজনীতিতে থাকার কারণেই কি বিভিন্ন ধরণের হিংসা, অসহিষ্ণুতার প্রকাশ দেখা যাচ্ছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে, নাকি এর জন্যে রাজ্যের রাজনৈতিক বাতাবরণ ও রাজনৈতিক সংস্কৃতি দায়ী? এ দেশের এবং এ রাজ্যের চলমান

রাজনীতি ও তার পিছনের কার্যকারণ সম্পর্কগুলো তাই চিহ্নিত করার প্রয়োজন রয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সম্প্রতি ঘটে যাওয়া অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনাগুলোর সঙ্গে এসবের যোগসূত্র খুঁজে দেখা জরুরি।

এই রাজ্যের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ছাত্র সংগঠনগুলোর কার্যকলাপ তথা ছাত্রছাত্রীদের চলমান সংস্কৃতিকে তাই বিচ্ছিন্ন ভাবে দেখার বিশেষ কোনো কারণ দেখি না। এ রাজ্যের সামগ্রিক রাজনৈতিক বাতাবরণ, এ রাজ্যের মানুষজনের সামাজিক এবং রাজনৈতিক চেতনার মান ও সংস্কৃতি বহুলাংশে ছাত্রসমাজকে যে প্রভাবিত করে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এছাড়া আরও যে বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ তা হলো এ দেশে তথা এ রাজ্যে অধিকাংশ ছাত্র সংগঠন কোনো না কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত এবং সেই রাজনৈতিক পার্টির নির্দেশনা এবং তাদের মতবাদ মূলত এই ছাত্র সংগঠনগুলি ও তাদের ইউনিয়নগুলির কার্যক্রম পরিচালিত করে। ফলে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে যেসব ঘটনা ঘটছে— তার সমস্ত দায়ভার ছাত্রসমাজের উপর চাপিয়ে দেওয়া যেমন অযৌক্তিক তেমনি অনৈতিকও বটে। পাশাপাশি মনে রাখা দরকার, দেশ ও আন্তজার্তিক স্তরের বিভিন্ন ঘটনা ও নানান বিবর্তনের বিষয়গুলো আজ আমাদের জীবনে যেমন পরিবর্তন আনছে তেমনই পরিবর্তিত ধ্যানধারণা ও মূল্যবোধ, আমাদের সমাজ ও সমাজ ব্যবস্থার অনেক কিছুকেই দ্রুত পাল্টে দিচ্ছে। পুরোনো মূল্যবোধের জায়গায় তথা দৃষ্টিভঙ্গিতে আজ যে সংকট গভীরতর হচ্ছে, ছাত্রসমাজ তার বাইরে থাকতে পারে না। একদিকে দেশজোড়া হানাহানি ও রাজনৈতিক ব্যভিচার, সামাজিক অবক্ষয়, হতাশা ও অনিশ্চয়তার জন্ম দিচ্ছে যার ছাপ সমাজে তথা নতুন প্রজন্মেও পড়ছে এবং এসবের প্রভাব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও যে পড়বে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

এ ভিন্ন এ রাজ্যের রাজনৈতিক সংস্কৃতির বিষয়গুলোও একটু খোলা মনে আলোচনায় আনা দরকার। বিভিন্ন রাজনৈতিক পার্টিতে বিভক্ত এ রাজ্যের মানুষজন এবং তাদের বিশ্বাস ও ধ্যানধারণার জায়গাটা বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির প্রতি গভীর আনুগত্য সম্ভবত বাঙালি জনমানসের একটি বিশেষ চরিত্র। দলের প্রতি শুধু প্রশ্নাতীত সমর্থন নয়, রাজনৈতিক দলগুলির প্রতি আমাদের যেন এক ধরণের 'দাস সুলভ' মনোভাব তৈরি হয়েছে যে বিষয়টা আমরা দেখেও দেখছি না। কয়েক যুগ ধরে গড়ে ওঠা এ রাজ্যের 'রাজনৈতিক বাতাবরণ' সম্ভবত মাথা নীচু করে 'ভৃত্যসুলভ' আচরণকে আরও শক্তিশালী করেছে। দুশো বছরের পরাধীনতার গ্লানি ও দাসত্ব বোধ বুকের ওপর থেকে উঠে গেলেও সম্ভবত এই 'বোধ' এখনও টিঁকে রয়েছে আমাদের চিন্তায় এবং মননে। পশ্চিমবাংলায় এই বিষয়টা কেন এত বেশি শক্তিশালী তার কারণগুলো খুঁজে দেখা দরকার, কেন ব্যক্তিমানুষ হিসেবে আমরা মাথা তুলে দাঁড়াতে পারি না। কেন আপন বৈশিষ্ট্যে আমরা সরব হই না? সাধারণ ভাবে ব্যক্তিমানুষের বিকাশ কেন ঘটছে না। ব্রিটিশের 'রাজধানী' হিসেবে শহর কলকাতা প্রায় একশো বছর ধরে বেড়ে উঠেছিল বলেই কি সেই প্রক্রিয়া আরও শক্তিশালী করেছে আমাদের 'দাস মনোবৃত্তি'? একে আর যাই হোক, রাজনৈতিক সচেতনতা বলা যায় না। ফুটবল ক্লাবের কট্টর সমর্থকেরাও স্বদলের ভুল সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠে। খেলার মাঠে খেলোয়াড়, কোচ ইত্যাদির উপযুক্ত খেলা কিংবা সদর্থক ভূমিকা না দেখতে পারলে তারা ক্ষিপ্ত হয়, খেলোয়াড়দের বিরুদ্ধে টিকা-টিপ্পনি কাটে, ক্লাবের অফিসঘর ইত্যাদি ভাঙচুর করে। ক্রিকেট পাগল এ দেশের আমজনতা তাদের প্রিয়তম ক্রিকেটার সচিন কিংবা রাহুলের ব্যর্থতায় শুধু বিমর্ষ হয় না, রাগে-ক্ষোভে তাদের ছবিতে জুতোর মালাও পরিয়ে দেয়। অন্যদিকে কিন্তু এ রাজ্যের তথাকথিত 'রাজনৈতিক সচেতন' দলের সমর্থকরা এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ ভিন্ন আচরণ করে থাকেন।

এসব দেখেশুনে মনে হয় রাজনৈতিক দলগুলির সমর্থকদের বোধহয় একটাই কাজ তা হলো, কিভাবে নিজদলের সমস্ত ভুল, অন্যায় ও অযৌক্তিক কাজকর্মকে যেনতেন প্রকারেন সঠিক বলে প্রমাণ করা কিংবা তাকে আগলে রাখার চেষ্টা করা। এখানে ব্যক্তির বোধ, বিচারবুদ্ধি সব ঢাকা পড়ে যায় কোনো এক 'অমোঘ বিশ্বাসের' কাছে, সেটা কখনও রাজনৈতিক মতবাদ আবার কোথাও স্রেফ বাস্তব বোধশূন্য হয়ে, শুধু কিছু শব্দের সমাহারে আটকে থাকি। এখানে ঘটনার বিচার-বিশ্লেষণ, বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনা সবই যেন অপাঙ্‌ক্তেয়। আমাদের রাজ্যের এই রাজনৈতিক দল সমর্থক মানুষদের মনোভাবের সঙ্গে বিশেষত দক্ষিণ ভারতের ফিল্মি কালচারের একটা গভীর সম্পর্ক রয়েছে। ওই সব রাজ্যে বিভিন্ন নামের প্রিয় চিত্রতারকাদের 'ফ্যান ক্লাবের' সদস্য সদস্যাদের মনোভাবের সঙ্গে আমাদের রাজ্যের রাজনৈতিক দল সমর্থকদের চিন্তাভাবনা, আচার-আচরণে কোথাও যেন একটা অদ্ভুত মিল খুঁজে পাওয়া যায়। আমরা অন্ধ বিশ্বাস আর প্রাণের আবেগে যেন ভেসে বেড়াই। বাস্তব থেকে মুখ ফিরিয়ে নিই, কোনো বৈজ্ঞানিক বিচার বিবেচনার ধার ধারি না।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামোয় ব্যক্তিমানুষ তার নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে দেশের দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে নিজের বুদ্ধি বিবেচনা প্রয়োগ করবে নিজের বক্তব্য, সমালোচনার কথা জানাতে পারবে তবেই না গণতন্ত্রের বিকাশ ঘটা সম্ভব। তা না হলে সমাজ ও দেশের উন্নয়নে কোনো ভূমিকা রাখা বা পরিবর্তন আনা সম্ভব?

আমাদের রাজ্যে এই চলমান রাজনৈতিক বাতারবণের বেড়ে ওঠা ছাত্রসমাজের কাছে নতুন কিছু আশা করা দুরূহ। সমাজে যেভাবে তারা বেড়ে উঠছে, সেই জায়গার থেকে সমাজের অগ্রণী অংশ হিসেবে এই মুহূর্তে কোনো সদর্থক ভূমিকা রাখতে পারছে না— এ-ও সত্যি। তাদের ভেতর থেকে বলিষ্ঠ কোনো লড়াকু নেতৃত্ব যে উঠে আসছে না তার পেছনে এ রাজ্যের বিগত কয়েকটা দশকের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ও তার সংস্কৃতি মূলত দায়ী। তবু বৃহত্তম কর্মকাণ্ড ও তার রাজনীতির আঙিনা থেকে ছাত্র সমাজকে সরিয়ে রাখলে বিশেষ কিছু উপকার হবে না। বরং তারা যাতে আরও বেশি করে রাজনৈতিক চিন্তাভাবনায় যুক্ত হতে পারে তার সুযোগ গড়ে দিলে— আজ না হলেও আগামী দিনে সুফল আসতে পারে। রাজনীতিতে তাদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণই শতফুল বিকশিত হতে সাহায্য করবে।

স্মরজিৎ জানা

একজন শিক্ষক ও একটি সৎ প্রয়াস

কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়-এর অধ্যাপকেরা অবসর প্রাপ্তির পর পেন্সন, গ্র্যাচুইটি ও পি এফ বাবদ যে বিপুল পরিমাণ অর্থ লাভ করেন তা ব্যাংক পোস্ট অফিস-এ সঞ্চয় করে সাধারণত নিশ্চিন্তে জীবন কাটতে পছন্দ করেন। ওই অর্থ নিজের ও পরিবারের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য ব্যয় করেন। গাড়ি বাড়ি বিদেশ ভ্রমণের মাধ্যমে জীবন উপভোগ করেন। এই চালু ধারার বাইরে এক বিরল ব্যতিক্রম হলেন কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নের অধ্যাপক ড. মণীন্দ্র নারায়ণ মজুমদার।

২০০৩ সালে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষকতা জীবনর থেকে অবসর নেবার পর তিনি ভাবতে থাকেন, কী ভাবে বিজ্ঞানকে ব্যবহার করে আরও বেশি মানুষকে বিজ্ঞান-মনস্ক ও উৎপাদনশীলতার কাজে লাগানো যায়। এ-ব্যাপারে তাঁর আদর্শ হলেন বিজ্ঞানী আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়। তাঁর নামেই তিনি তৈরি করলেন এক গবেষণাগার প্রতিষ্ঠান। এই গবেষণাগার দেখভালের জন্য একটি অছি পরিষদও গঠন করা হয়েছে। তাঁর অবর্তমানে এই গবেষণাগারের মালিকানা বর্তাবে ওই অছি পরিষদের। তিনি চান বর্তমানের তরুণ বিজ্ঞানীরা এবং কলেজ ছাত্রছাত্রীরা তাঁর সহায়তায় এগিয়ে আসুক। এই প্রতিষ্ঠান হবে সম্পূর্ণ মুনাফাহীন একটি সংস্থা। এই সংস্থার কাজ হবে, ১. কেমিক্যাল ডেমনস্ট্রেশন দেওয়া; ২. চলমান গবেষণাগার তৈরি করা, ৩. জল পরীক্ষা করা (যেমন আর্সেনিক) ইত্যাদি। এই প্রতিষ্ঠান মূলত গবেষণামুখী হয়ে উঠবে এবং বিভিন্ন মানুষের মধ্যে বিজ্ঞানচেতনা জাগাবার চেষ্টা করবে।

এ-ব্যাপারে মণীন্দ্রবাবুর নিজের ভাবনা-চিন্তার পরিসরটি পাওয়া যাবে তাঁর নিজের লেখায়। এই প্রতিদেনের সঙ্গে নীচে সেটি প্রকাশ করা হলো।

ব্যক্তি বা সমাজ জীবনের সর্বত্রই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষার অসাধারণ গুরুত্ব আজ সর্বসম্মত। কিন্তু স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে আজকাল যে বিজ্ঞান শিক্ষা গবেষণা প্রচলিত তাতে সত্যিকার বিজ্ঞানশিক্ষা ও গবেষণা যে হচ্ছে না তা বর্তমান লেখক তার দীর্ঘকালের বিজ্ঞান অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও গবেষণা জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে উপলব্ধি করেছেন। আরও কিছু অভিজ্ঞ মানুষেরও তাদৃশ অভিজ্ঞতা। সরকারি অনুদানে চলা বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলি ঝিমিয়ে পড়ছে। অধ্যাপক ও বিজ্ঞানকর্মীদের বেতন বেশ বেড়েছে; অথচ ব্যক্তি বা গোষ্ঠীমালিকানার নানারকম ব্যাবসায়িক প্রতিষ্ঠানসমূহ সৃষ্টি হয়েই চলেছে। সে সব প্রতিষ্ঠান থেকে উৎপন্ন শিক্ষার্থীদের প্রকৃত বিজ্ঞান শিক্ষা হচ্ছে এমন মনে হয় না। সেখান থেকে পাশ করা ছাত্রছাত্রীদের কিছু দেশে বা বিদেশের, প্রধানত আমেরিকায়, কর্পোরেট সংস্থাগুলিতে দক্ষ শ্রমিকের কিছু কাজ হয়তো পাচ্ছেন। বাকিরা দেশের মানুষ, পরিবেশ ও সমাজের উন্নতিতেও সক্রিয় কোনো অংশ নিতে পারছেন না। বেকার ক্রমবধমান।

ছাত্রছাত্রীদের উপর নীরস,অপ্রয়োজনীয় সিলেবাসের বোঝা অযথা বেড়েই চলেছে। এদেশের বিদ্যালয় ও উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি ভাবতে শেখায় না। শুধু মুখস্ত করে নম্বর জোগাড় হয়। শিক্ষক, অধ্যাপকরাও মুখস্ত করেই ক্লাস লেকচার দিয়েই অনেক পয়সা নিয়ে যান। ছাত্রছাত্রীদের ভাবতে, হাতেকলমে কাজ করতে শেখানো হয় না। বিখ্যাত আমেরিকান পদার্থবিজ্ঞানী রিচার্ড ফাইনম্যান তাঁর *Surely You're Joking, Mr. Feinman* গ্রন্থে ব্রাজিলের পদার্থবিজ্ঞান শিক্ষা ব্যবস্থার দুরবস্থা দেখে বলেছেন: 'ব্রাজিলে সত্যিকার পদার্থবিজ্ঞান শিক্ষা কখনও ছিল না, এখনও নেই, কখনও হবেও না।' ভারতের পদার্থবিজ্ঞান শিক্ষাও এমনই যে কয়েক বছর আগে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রয়াত অধ্যাপক শ্যামল সেনগুপ্ত বর্তমান লেখককে বলেছিলেন ভারতের পদার্থবিজ্ঞান শিক্ষা ব্রাজিলের অনুরূপ। কলকাতায় থাকাকালীন বিখ্যাত বিজ্ঞানী জেবিএস হলডেন *Science and Indian Culcutre* (১৯৬৫) গ্রন্থেও এই রকমই মন্তব্য করে গেছেন।

দেশের মানুষ, পরিবেশ ও সমাজের কল্যাণে যুব সম্প্রদায় সক্রিয় ভাবে কোনো অংশ নিতে পারছেন না। সমাজ মানসে কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস ও নৈরাজ্য বেড়েই চলেছে। হাতে কলমে পরীক্ষার মাধ্যমে বিজ্ঞান শিক্ষা, উৎপাদনে বিজ্ঞানের প্রয়োগ, এমনকি যেখানে সে সব চলছে সে সব দেখাও বিশেষ হয় না। বিজ্ঞান শিক্ষা আনন্দের পরিবর্তে কষ্টকর বোঝা হয়েই থাকছে। অনুন্নত অঞ্চলের দরিদ্র ঘরের ছেলেমেয়েরা উচ্চতর বিজ্ঞানশিক্ষা, গবেষণা প্রতিষ্ঠানে আসতেই পারছে না। অথচ মেধা ও বিজ্ঞান প্রতিভা বিরল হলেও সর্বত্রই তা ছড়িয়ে আছে।

সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নে বিজ্ঞানের অপরিসীম গুরুত্বের কথা উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণের পথিকৃতরা সম্যক উপলব্ধি করে গেছেন। রামমোহন রায়, ডিরোজিও, ডেভিড হেয়ার, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত,বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ থেকে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, মেঘনাদ সাহা প্রমুখ বিজ্ঞান প্রসারে প্রয়াসী হয়েছিলেন। সেই চিন্তা ও কর্মপ্রবাহ গত পঞ্চাশ বছরে ধ্বংসের মুখে। বর্তমান লেখক তার প্রত্যক্ষদর্শী। জীবন সায়াহ্নে তাই বর্তমান প্রয়াসের সূত্রপাত। শুরু তো করা যাক। আমার চলে যাবার পরেও অন্যরা যাতে একে উন্নত ও চলমান রাখতে পারেন, তার পরিকাঠামো ও কিছু ব্যবস্থা করে যেতে প্রয়াসী হয়েছি। সকলের শুভেচ্ছা ও অংশগ্রহণ প্রার্থী। □

গুণ্ডাদের গুণ্ডামির দায় বর্তাবে ছাত্রদের উপর?

অসীম চট্টোপাধ্যায়

ছাত্র রাজনীতি ও ছাত্র আন্দোলন নিয়ে যে সাম্প্রতিক বিতর্ক চলছে, তাতে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যাজীবীদের যোগদান অবশ্যই নতুন মাত্রা যুক্ত করেছে। প্রত্যাশিত ছিল যে, আমাদের বিদ্যাজীবীদের সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণে, তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণে ও পক্ষপাতহীন বিচারে সমসাময়িক ছাত্র রাজনীতির ও ছাত্র আন্দোলনের জটিল সমস্যা উন্মোচিত হবে, সমাধানের দিশা অন্তত স্পষ্ট হবে। কিন্তু হতাশার সঙ্গে বলতেই হচ্ছে যে, সেই রাস্তায় না-হেঁটে বিতর্কটি সরকারি ফরমানের পরিসরে আটকে থেকে 'ছাত্রদের রাজনীতি করা উচিত কি না' বা 'ছাত্র সংসদ নির্বাচন চিরকালের জন্য বন্ধ করা কাম্য কিনা', এই অকিঞ্চিৎকর প্রশ্নাবলির আবর্তে মগ্ন থেকেছে। ছাত্র মানসিকতা, ছাত্র রাজনীতি ও ছাত্র আন্দোলন সম্বন্ধে অজ্ঞতার কারণে যে সব ভ্রান্তি জনমানসে গেড়ে বসে আছে, সমগ্র বিতর্কটি সেই ভ্রান্তিতেই কমবেশি আচ্ছন্ন থেকেছে।

ভ্রান্তি এক, রায়গঞ্জে অধ্যক্ষ নিগ্রহ, হরিমোহন ঘোষ কলেজে পুলিশ-হত্যা বা প্রেসিডেন্সি কলেজের কদর্য ঘটনা — শিক্ষায়তনে এই সব হিংসার দায় ছাত্রদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। অথচ এই সব ঘটনায় ছাত্ররা কোথায়! ঘটনা হলো, রায়গঞ্জের তিলক চৌধুরী, একবালপুরে মুন্না বা ইবনে বা প্রেসিডেন্সি কলেজে পার্থ বসু বা তমোঘ্ন ঘোষ, এঁরা কেউই ছাত্র নয়। আসলে বিগত দিনের ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে আজকের ছাত্র আন্দোলনের পার্থক্য এখানেই। আগে, ভুল হোক আর ঠিক হোক, ছাত্র আন্দোলন ছিল ছাত্রদেরই আন্দোলন, এখন ছাত্র আন্দোলনে ছাত্রদের ভূমিকা প্রান্তিক, এলাকা দখলের রাজনীতির দাপটে নেতাদের মদতে সেই জায়গা দখল করেছে গুণ্ডা-মস্তানরা। আর সামগ্রিক ছাত্র আন্দোলনের অবস্থা নিতান্ত করুণ। আগে গুণ্ডারা ছাত্রদের সমঝে চলত, এখন ছাত্ররা গুণ্ডাদের সমঝে চলে! অথচ শিক্ষায়তনে হিংসার দায় বিনা প্রতিবাদে পড়ছে ছাত্রদের ঘাড়ে। গুণ্ডাদের দমন করার পরিবর্তে প্রশাসন ছাত্রদের অধিকার হরণ করার পথে সমাধান খুঁজছে! ছাত্র নির্বাচন ঘিরে হিংসা, অতএব নির্বাচন বন্ধের ফরমান খানিকটা জন্মজলের সঙ্গে সদ্যোজাতকে ফেলে দেওয়ার মতো।

ভ্রান্তি দুই, ছাত্রদের নাবালক হিসেবে দেখার সামন্ততান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি। দেশের সংবিধান যেখানে আঠারো বছর বয়সীদের সচেতন নাগরিক হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছে, সেখানে ছাত্রদের রাজনীতি করার বা সংসদ নির্বাচন করার অধিকার নিয়ে প্রশ্ন তোলা নৈতিক ভাবে অন্যায়, আইনের দিক থেকে সংবিধান-বিরোধী এবং সামাজিক ভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। আসলে এর পিছনে কাজ করছে ছাত্রদের নাবালক এবং এর জন্য দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক ভাবার মানসিকতা। ছাত্রদের বয়স ও অভিজ্ঞতা কম এবং পরিণামদর্শিতার ভাবনা দুর্বল। হয়তো সে জন্যই ছাত্রদের প্রাপ্য মর্যাদা দানে অনেকেই কাতর। কিন্তু ছাত্রদের রয়েছে তীব্র আবেগ, তীব্র ন্যায়-অন্যায় বোধ এবং আদর্শনিষ্ঠ চারিত্রিক সততা। কঠিন সত্য এই যে, দেশের স্বাধীনতার আগে এবং পরে সকল গণআন্দোলনে, সে সত্যাগ্রহ হোক, খাদ্য আন্দোলন হোক বা দেশের গণতান্ত্রিক কাঠামো রক্ষার আন্দোলন হোক, এই অপরিণামদর্শী ছাত্ররা ব্যতিক্রমহীন ভাবে সব সময়ে সংগ্রামের সামনের সারিতে থেকেছে। হাস্যকর যে, এক দিকে ছাত্ররা প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচনে শামিল হবেন এবং অন্য দিকে তাঁদের রাজনীতি করার অধিকার থাকবে না। আজ যদি ছাত্ররা দাবি তোলেন যে, ৬৫ বছরের পর সাবধানী অতি সতর্কতা ও পরিণামদর্শিতার কারণে মানুষ এত রক্ষণশীল হয়ে পড়েন, যে, প্রগতির স্বার্থে তাঁদের ভোটাধিকার হরণ করা হোক, তা যেমন হাস্যকর হবে, ছাত্রদের রাজনীতি করার অধিকার হরণের প্রস্তাব সমান হাস্যকর।

উদ্বেগ প্রকাশ করা হচ্ছে যে, দলীয় রাজনীতিকরণে ছাত্ররা দলের ক্রীড়নক হয়ে পড়বে। তাই দলীয় রাজনীতি নৈব নৈব চ। আমার প্রস্তাব হলো, এ সব ব্যাপারে ছাত্রদের উপর আস্থা রাখাই ভালো। আমাদের সকলের যেমন দলীয় রাজনীতি করার বা না-করার অধিকার আছে, তেমনই ছাত্রদেরও তা আছে। আমার অভিজ্ঞতা বলে যে, ছাত্ররা স্বভাবতই প্রতিষ্ঠান-বিরোধী, কর্তৃত্ব-বিরোধী, স্তাবকতা-বিরোধী।

বলা হচ্ছে যে, ছাত্র সংসদ নির্বাচনে যেহেতু সাধারণ নির্বাচনের মতো সরকার গঠিত হয় না, তাই ছাত্র সংসদ নির্বাচন অপ্রয়োজনীয়। এই যুক্তিতে তো সেনেট, সিন্ডিকেট, ওয়েবকুটা, শিক্ষক সংগঠন— সকলের নির্বাচন নাকচ করা যায়। এর সরল অর্থ হলো, ক্ষমতাকেন্দ্রিক অধিকার প্রকৃত অধিকার, বাকি সব এলেবেলে। আসলে, প্রতিনিধি নির্বাচনের গণতান্ত্রিক পাঠ ছাত্ররা লাভ করে ছাত্র সংসদ নির্বাচনে। এই অধিকার কেড়ে নেওয়ার

অধিকার কারও নেই। ছাত্র সংসদ নির্বাচনে এই স্থগিতাদেশ 'জরুরি অবস্থা' ঘোষণার মতোই ভয়াবহ।

ভ্রান্তি তিন, বলা হচ্ছে যে, দেশ-দশের সমস্যা নয়, ছাত্ররা তাদের নিজস্ব দাবিদাওয়া নিয়ে আন্দোলন করবে। কিন্তু ঘটনা হলো, জাতীয়-আন্তর্জাতিক বিষয়গুলিতেই ছাত্ররা বার বার পথে নেমেছে, শত চেষ্টা সত্ত্বেও নিজস্ব দাবিদাওয়া নিয়ে ছাত্র আন্দোলন গড়ে ওঠেনি। কারণ, নিজস্ব দাবিদাওয়া নিয়ে আন্দোলনকে ছাত্ররা স্বার্থপরতা ভাবে, বরং দেশ-দশের সমস্যা তাদের উদ্বেলিত করে অনেক বেশি। তাদের হাতে যে রয়েছে বিশ্বভুবনের ভার! ট্রেড ইউনিয়ন লজিকে ছাত্র আন্দোলন চলে না।

ভ্রান্তি চার, বিভিন্ন প্রস্তাবে শিক্ষায়তনে সুরক্ষার প্রশ্নে প্রশাসন, কলেজ কর্তৃপক্ষ এমনকী শিক্ষক-মণ্ডলীর ওপরে নির্ভর করা হচ্ছে। শুধু ছাত্রছাত্রীরা বাদ, অথচ ছাত্রশক্তিই চিরদিন শিক্ষায়তনে সুরক্ষার দায় বহন করে এসেছে। ভুলে যাওয়া হচ্ছে যে, 'ক্যাম্পাস ডেমোক্রেসি'ই হচ্ছে 'ক্যাম্পাস ভায়োলেন্স' রোধের একমাত্র নির্ভরযোগ্য গ্যারান্টি।

ষাটের দশকে প্রেসিডেন্সি কলেজের অভিজ্ঞতা এরই সাক্ষ্য। ১৯৬৬ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ ছাত্র আন্দোলনে, যা এখন ইতিহাসের সম্পদ হিসেবে স্বীকৃত, কলেজ বন্ধ থাকে চার মাস, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সহ পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত কলেজ বন্ধ থাকে দেড় মাস— ছাত্র অধিকারের প্রশ্নে এমন আন্দোলন আগে বা পরে দেশ দেখেনি। এই আন্দোলনেও কিন্তু সাম্প্রতিক হামলার মতো কদর্য ঘটনা ঘটেনি। ছাত্রদের খুন করার জন্য গুণ্ডারা দৌড়চ্ছে, লুম্পেনরা 'রেপ' করার ধমকি দিয়ে মেয়েদের তাড়া করছে, সোহিনী দাশগুপ্তের মতো বিশ জন মেয়ে বাঁচার জন্য নিজেদের কলেজে ক্লাস-ঘরে বাইরে থেকে তালা মেরে অন্ধকারে বসে আছে এক ঘণ্টা, ভাবা যায় না।

এর অর্থ এই নয় যে, প্রেসিডেন্সিতে বাইরের হামলা হয়নি। মনে আছে, কলেজ গেটে অবস্থানের সময় বার তিনকে বোমা পড়ে কলেজ গেটে, হামলা হয় কয়েক বার। কিন্তু ছাত্রশক্তির জোরে আমরা তা প্রতিরোধ করি। এই প্রয়োজনেই প্রেসিডেন্সিকে আমরা দ্বীপ করে রাখিনি— যে কোনো ছাত্রের জন্য কলেজ ছিল অবারিত দ্বার। আর ছিল আদর্শগত ভাবনা এবং একটা উন্নত সমাজের স্বপ্ন। *স্টেটসম্যানে*-র শ্রমিকসাথিরা, বিভিন্ন মহল্লার ছাত্র-যুব আর সাংস্কৃতিক কর্মীবাহিনী, আমাদের উপরে হামলার খবর পেয়ে উৎপলদা, জোছনদার মতো নেতারা হাজির হতেন। কলেজ গেটে পুলিসের মার খেয়েছিলেন বিমানদা ও কলেজের সাধারণ সম্পাদক অমল সান্যাল। নিয়মিত আসতেন দীনেশদা, শ্যামল চক্রবর্তী, সুবিনয়দার মতো বিপিএসএফ নেতারা। আবার অন্য ধারার শৈবাল আজিজুল-নির্মল ব্রহ্মচারী মাঝে মাঝে দেখা দিতেন। মূলশক্তি ছিল আমাদের বাহিনী: আমি, অমল, সব্যসাচী,অশোক সেনগুপ্ত, সুদর্শন-শরদিন্দু, রণবীর-সুব্রত-অরুণ, ত্রিদিব-দীপেশ-সৌরীশ-দীপক, সুমিত-গৌতম, প্রতুল-বরুণ-মুকুল-পাবক, প্রণবেশ... অসংখ্য নামের মিছিল। আমাদের সমর্থনে ছিল অর্কদা-প্রদ্যোত-শংকর-রতন-দীপাঞ্জনের মতো প্রাক্তনীরা। কলেজে হামলার খবর পেলেই সঙ্গে ছাত্রবাহিনী নিয়ে হাজির হতো বঙ্গবাসীর বিজন-অচিন্ত্য-তপন, সিটি কলেজের দীপক-দিলীপ-বিপ্লব হালিম, বিদ্যাসাগরের পল্লব-সুব্রত-নিমাই, মৌলানা আজাদের কমল, স্কটিশের দীপেন্দু, মির্জাপুর সিটির অপূর্ব, সুরেন্দ্রনাথের বাসব-অনুপ-কৌশিক। কোন্ গুণ্ডা-মস্তান হামলা করবে! অর্থাৎ এক কলেজে হামলা মানেই নানা কলেজ থেকে, মহল্লা থেকে, পাড়া থেকে পিলপিল করে জড়ো হবে বাহিনী। একটা সময় ছিল যখন রাজপথে ছাত্রমিছিল আর বাতায়ন থেকে প্রেসিডেন্সির এলিট ছাত্রদের শুধু তাকিয়ে দেখা। এই 'এলিটিজম' ভেঙেই নতুন প্রেসিডেন্সির জন্ম। আমাদের হাতিয়ার ছিল তিনটে, এক, একটা আদর্শ, স্বপ্ন। দুই, ঐক্যবদ্ধ ছাত্রশক্তি, তিন, সহযোগী শক্তিজোট। আমাদের সঙ্গে একই স্বপ্ন দেখত এরা। এই শক্তিজোট ছিল ক্যাম্পাস ডেমোক্রেসির ফল।

ক্যাম্পাস ডেমোক্রেসির এই চর্চা নৈরাজ্য ও শৃঙ্খলাহীনতার জন্ম দিত না? মাঝে মাঝে অবশ্যই সমস্যা হয়েছে, কিন্তু তা শুধরে নেওয়া হতো। আসলে ছাত্র আন্দোলনে আতিশয্য হবেই। তাতে গুরুত্ব না দিয়ে 'এসেন্স' বা মূল বিষয়টা দেখতে হবে।

ষাটের দশকের ছাত্র আন্দোলনের একটা সমালোচনা হলো, ঐতিহ্যের দায় বহন না করে কালাপাহাড়ি বৃত্তি। অনেকেই সাম্প্রতিক বেকার ল্যাবরেটরি হামলার সূত্রে স্মরণ করছেন ৪৭ বছর আগে বেকার ল্যাবে হামলার ঘটনাকে। সে দিন ছাত্ররা উত্তেজিত হয়ে হামলা চালিয়েছিল সত্য, কিন্তু ছাত্রদের উত্তেজনার কারণ নিয়ে কিছু বলা হচ্ছে না। ঘটনা হলো, তার আগেই ছাত্রদের চোখের সামনে ৩৯ জন ছাত্রকে পেটাতে পেটাতে পুলিশ নিয়ে যায়। তারই প্রতিক্রিয়ায় স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ আছড়ে পড়ে কলেজে। আমরা তা সামলে নিয়েছিলাম। এই প্রতিক্রিয়া অবশ্যই আতিশয্য, কিন্তু এর মূলে যে রয়েছে ছাত্রদের আবেগ, না-বোঝার কথা নয়।

শে ষ ক থা

লিংডো কমিশনের আচার সংহিতায় আমি ছাত্র আন্দোলনের যুক্তি দেখি না। মতাদর্শই হলো ছাত্র আন্দোলন ও ছাত্র রাজনীতির জিয়নকাঠি। ঘটনা হলো, যখনই মতাদর্শ নতুন স্বপ্ন দেখিয়েছে, ছাত্রসমাজ উদ্বেল হয়েছে। স্বাধীনতার স্বপ্ন, সমাজাতন্ত্রের স্বপ্ন, কৃষি বিপ্লবের স্বপ্ন, দেশে গণতান্ত্রিক কাঠামো রক্ষার স্বপ্ন তাদের উদ্বুদ্ধ করেছে।আজকের ছাত্র আন্দোলনের দুরবস্থার আসল কারণ নিহিত রয়েছে এখানেই। তাদের সামনে সম্ভাবনাময় নতুন মতাদর্শ বা স্বপ্ন নেই। ছাত্র আন্দোলনের পুনরুত্থান দাবি করছে মতাদর্শের পুনর্নির্মাণ। অনেকেই ঐতিহ্যের কথা বলেন। ঐতিহ্যের অর্থ কখনওই পুরোনো চিন্তার দাসত্ব নয়। পুরনো ঐতিহ্য রক্ষা করে শর্ত ভেঙে বারবার নতুন ঐতিহ্য গড়ে ওঠে। আজকের প্রেসিডেন্সি কলেজ তার সাক্ষী।

অনেকেই ষাটের দশকের ছাত্র আন্দোলনকে আজকের জন্য অনুপ্রেরণাস্থল ভাবেন। তাঁদের স্লোগান হলো, 'revive the spirit of the sixties'। কিন্তু ইতিহাসের অবিকৃত পুনরাবৃত্তি হয় না। ষাটের দশকের আন্দোলন যেমন আগের ছাত্র আন্দোলনের যুগপৎ কনটিউনিয়েশন অ্যান্ড নেগেশন, একবিংশ শতাব্দীর ছাত্র আন্দোলনও হবে ষাটের দশকের কনটিউনিয়েশন অ্যান্ড নেগেশন— শুধু পুনরাবৃত্তি নয়, শুধু নাকচ নয়। হয়তো একবিংশ শতাব্দীর বাস্তবতায় এ ভাবেই ষাটের দশকের ছাত্র আন্দোলনের নবীকরণ ঘটবে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : *আনন্দবাজার পত্রিকা*, ১৪ মে ২০১৩।

নদী শুকিয়ে যাচ্ছে

কল্যাণ রুদ্র

নদীকে ঘিরে মানুষের কৌতূহল বাড়ছে। আমার মনে আছে যে, ২০০০ সালের সেই ভয়াবহ বন্যার পর গ্রাম বাংলায় ঘুরে ঘুরে দেখেছি, মানুষ জানতে চাইছে, বুঝতে চাইছে। কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে আপনি যদি নদীর কথা জানতে চান, বুঝতে চান, তাহলে দেখবেন সবই স্বাধীনতার আগে লেখা বই। স্বাধীনতার পরে, এই ছয় দশকে বাংলার নদী আমূল বদলে গেছে। অথচ তারপরে নদী নিয়ে লেখা বা গবেষণা খুব বেশি হয়নি। আমি অল্প যা করেছি সেগুলো খুব অপটু হাতে, এমন কিছু নয়। মেঘনাদ সাহা বলতেন যে, উদ্বৃত্ত জল ও তার অসম বণ্টন বাংলার সমস্যা। সেটা খুব বেশিদিন আগের কথা নয়, আট দশক আগের কথা।

এই সময় আপনি যদি দক্ষিণবঙ্গ থেকে উত্তরবঙ্গ পর্যন্ত ঘুরে দেখেন তাহলে দেখবেন প্রায় সব নদী শুকিয়ে গেছে, খাত বালি পাথরে ভর্তি হয়ে গেছে। প্রকৃতিকে আমরা যে ভাবে ব্যবহার করার চেষ্টা করেছি, যে ভাবে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেছি তার প্রতিক্রিয়া হয়েছে সুদূরপ্রসারী। এই প্রসঙ্গে যে সব প্রামাণ্য গ্রন্থগুলো সারা পৃথিবীর মানুষ পড়েন সে সবই ইউরোপ আমেরিকার অধ্যাপকদের লেখা। বাংলার নদী সম্বন্ধে দু'তিনটে ছাড়া প্রামাণ্য বই নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের পর আমার যা কিছু শেখা সেটা কিন্তু গ্রাম বাংলার মানুষরা শিখিয়েছেন। সম্প্রতি প্রকাশিত অভ্র ঘোষ সম্পাদিত *বিতর্কিকা* পত্রিকায় দেখবেন 'কেদার মন্ডলের নদী কথা' নামে একটি সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়েছে। ভদ্রলোক পেশায় কৃষক, উনি বলেন ওঁর লেখাপড়া ক্লাস সেভেন পর্যন্ত কিন্তু এমন একজন প্রাজ্ঞ মানুষ আমি কম দেখেছি। মালদায় গঙ্গার ভাঙনে ওঁর ঘর ভেঙেছে বার পাঁচেক, তবু উনি নদীর পাড় ছেড়ে যান নি। হাতের তালুর মতো নদীকে চেনেন, উনি বলতে পারেন, কেন নদী ভাঙে? এরকম মানুষ গ্রামবাংলায় আরও অনেক ছড়িয়ে আছেন। খুব বেশি মানুষ ওঁকে চেনেন না কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের পরে, আমার শিক্ষক কে যদি জানতে চান তবে আমি বলব কেদার মণ্ডলের কথা। ওঁর উদ্দেশ্যে আমি একবার প্রণাম জানাচ্ছি।

আমার বোঝার ইচ্ছে ছিল, এবং যা আমি এখন বোঝবার চেষ্টা করছি, কেন নদী এরকম করছে? এইটাই যদি ভালো করে বুঝতে পারি তাহলে আমাদের গোড়ায় ফিরে যেতে হবে। বুঝতে হবে কিভাবে এই নদীগুলো এসে পশ্চিমবঙ্গে পড়েছে। নদীকে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ শুধু একটা বহমান ধারা হিসেবে দেখে না। ব-দ্বীপের নদী হচ্ছে বহমান জল আর ভাসমান পলির স্রোতধারা। আপনি যে কোনো নদীর জল যদি হাতে করে তুলে নেন তাহলে দেখতে পাবেন নদী কিভাবে পলি বহন করছে। আর পলি হচ্ছে বাংলার কৃষি অর্থনীতির ভিত্তি।

বহমান নদীর ধারাটা যদি আপনি লক্ষ করেন, তাহলে দেখবেন, উত্তরবঙ্গের নদীগুলো জুলাই মাসের শেষাশেষি নাগাদ সর্বোচ্চ উচ্চতায় পৌঁছোয়, অর্থাৎ সব চেয়ে বেশি জল ওই সময় বয়ে যায়। দক্ষিণবঙ্গের এই অবস্থা দেখা যায় অগাস্ট মাসের শেষে বা সেপ্টেম্বরের গোড়ায়। সেই সময় নদী আর তার খাতের মধ্যে থাকে না, সে প্লাবন ভূমিতে ছড়িয়ে যেতে চায়— এটাকে আমরা বন্যা বলি। প্লাবন ভূমিতে নদীর যাত্রা একটা স্বাভাবিক প্রাকৃতিক ঘটনা। সে কি করে? সে বয়ে আনা জলটা প্লাবনভূমিতে ছড়িয়ে দেয়। কিন্তু দু'দিন বাদে বন্যার জল আবার নদীতে ফিরে যায় বা অন্য খাত দিয়ে বেরিয়ে যায়; প্লাবনভূমিতে ফেলে রেখে যায় পলির স্তর। এই ভাবে নদী তার গতিশীল ভারসাম্যকে রক্ষা করে।

ইংরেজরা বিশাল এই দেশটাকে দখল করার পর বুঝল যদি প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল থেকে খাজনা সংগ্রহ করতে হয় তবে জমিদারদের হাতে জমি দিতে হবে, লাগু হলো চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইন। জমিদাররাই প্রথম নদীতে বাঁধ দেওয়ার কাজ শুরু করে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে ইংরেজরা বাষ্পীয় শক্তি ব্যবহার করতে শিখছে, তারা লোহা আর ইস্পাতের ব্যবহার দক্ষতার সঙ্গে করছে, সিমেন্টের ব্যবহার শিখছে। ইউরোপে নানা প্রকৌশল জন্ম নিচ্ছে, বাড়ছে প্রকৃতির উপর আধিপত্য বিস্তারের প্রবণতা, যাকে বলা হয় 'ইঞ্জিনিয়ারিং অফ কমান্ড অ্যান্ড কন্ট্রোল'।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে মেঘনাদ সাহার মতো বিজ্ঞানীরা ভাবছেন, প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে, বদলে দেওয়া যাবে। এসব কথা ভাবছেন মানুষের মঙ্গলের জন্যে। জমিদার ও ঔপনিবেশিক শাসকরা দেখেছিল, বন্যা হলেই মাঝে মাঝে খাজনা সংগ্রহে অসুবিধে হচ্ছে। দামোদরকে বলা হলো Sorrow of Bengal, বাংলার দুঃখ। তারা চাইল দামোদরকে নিয়ন্ত্রণ করতে। অথচ অন্য এক সাহেব হ্যামিলটন বলছেন, বর্ধমান জেলা বা নিম্ন দামোদর অববাহিকা ভারতবর্ষের মধ্যে সবচেয়ে কৃষি সমৃদ্ধ এলাকা। নিম্ন দামোদর অববাহিকার কৃষি সমৃদ্ধির মূলে ছিল বন্যার জলে ভেসে আসা পলি যা প্লাবন ভূমিতে সঞ্চিত হয়ে জমির উর্বরতাকে বাড়িয়ে দিত।

কিন্তু শাসকরা দেখল বন্যা হলে খাজনা আদায়ের ঘাটতি ছাড়াও যাতায়াতে অসুবিধে হচ্ছে। জি টি রোড-টা জলের নীচে চলে যাচ্ছে, তারা ইতিমধ্যে রেললাইন পাতাতে আরম্ভ করেছে। একই সঙ্গে শুরু হলো নদীর পাড় বরাবর মাটির বাঁধ দেওয়ার কাজ যাতে বন্যার জল প্লাবনভূমিতে ঢুকতে না পারে। নদীতে বাঁধ দেওয়ার পর ছোটো আকারে বন্যা বন্ধ হলো কিন্তু নদী প্লাবনভূমিতে প্রতি বছর যে পলি ফেলত সেটা বন্ধ হয়ে গেল আর নদীর খাতে আস্তে আস্তে সেই পলি জমতে আরম্ভ করল। ক্রমশ কৃষিক্ষেত্রে তার প্রভাব পড়তে

আরম্ভ করল, কারণ প্রতি বছর নতুন পলিতে যে কৃষিক্ষেত্র সমৃদ্ধি হতো সেই প্রক্রিয়াটা বন্ধ হয়ে গেল। যে নিম্ন দামোদর অববাহিকা একটা কৃষি সমৃদ্ধিতে ভারত শ্রেষ্ঠ বলে খ্যাতি পেয়েছিল সেখানেই দুর্ভিক্ষ ও মহামারি দেখা দিল।

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি বাংলায় রেললাইন পাতার কাজ শুরু হচ্ছে। এই রেললাইন পাতা প্রসঙ্গে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে একটা বিতর্ক হয়েছিল; বিষয়, বাংলার উন্নতি কিভাবে সম্ভব? এই বিতর্কটার সময় একদল ইঞ্জিনিয়ার বলছেন, বাংলায় অসাধারণ নদী ব্যবস্থা আছে, সেই নদীপথগুলোকে আমরা নৌপরিবহণে ব্যবহার করি। আর একদল ইঞ্জিনিয়ার বলছেন, না আমরা রেললাইন তৈরি করি। কারণ তাঁরা তখন বাষ্পীয় শক্তি আবিষ্কার করে ফেলেছেন। এই বিতর্কটার সময়ই সিপাহি বিদ্রোহ, সেটা ১৮৫৭ সাল। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সিদ্ধান্ত নিল, যদি বিদ্রোহ দমনে দ্রুত সৈন্যবাহিনী পাঠাতে হয় তবে রেলপথটাই আমাদের বেছে নিতে হবে। ঠিক হলো, সম্ভাব্য বন্যার যে উচ্চতা, তার উপরে রেললাইন রাখতে হবে।

অতএব লাইনের ধার বরাবর গর্ত করে, মাটি তোলো আর জঙ্গল মহল থেকে সব শালগাছ কেটে রেললাইনের স্লিপার তৈরি করো। আপনি যদি বাংলার রেল লাইনের মানচিত্রটি লক্ষ করেন তাহলে দেখবেন— রেললাইন নদীর বুকের উপর দিয়ে আড়াআড়ি গেছে। এই ভাবে যাওয়ার ফলশ্রুতিতে হলো কী, প্লাবনভূমিতে নৈদী যে জলটা ছড়িয়ে দিত সেটা বন্ধ হলো আর ওই যে গর্তগুলো কাটা হলো ওরা হয়ে উঠল ম্যালেরিয়ার আঁতুড়ঘর। বড়ো আঘাত লাগল গ্রাম বাংলার জনজীবন ও কৃষি অর্থনীতিতে। এ প্রসঙ্গে মেঘনাদ সাহা ছাড়া আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়েরও লেখা আছে।

১৯৪৭ সালে সাহেবরা চলে গেল কিন্তু যাদের হাতে নদী শাসনের দায়িত্ব দেওয়া হলো তারা মূলত বি ই কলেজ বা আইআইটি থেকে পাশ করা ইঞ্জিনিয়ার বা প্রকৌশলী। তাদেরও যে দর্শনে উদ্বুদ্ধ করা হলো সেই দর্শনটা হচ্ছে, ওই Command and Controll ইঞ্জিনিয়ারিং। বাংলার কৃষকরা বহুদিন যে নদীর সাথে ঘর করেছে, সেই নদী এবার বন্দি হলো বড়ো বাঁধ, জলাধার ও খালের নেটওয়ার্কে। বলা হলো— এবার বন্যা হবে না, সেচের ব্যবস্থা হবে, বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে— নাম দেওয়া হলো বহুমুখী নদী পরিকল্পনা।

আমরা দেখলাম, দেশ জুড়ে পাঁচ হাজার একশো বাঁধ-জলাধার তৈরির পর ৩৮ শতাংশের বেশি জল চাষের জমিতে যাচ্ছে না। ভারত সরকার প্রকাশিত তথ্য এ-কথা বলছে। কৃষকরা যে পদ্ধতিতে চাষ করত, যে চিরায়ত পদ্ধতিতে সেচ করত— সেটা ভেঙে গেল।

জমিতে নতুন ধরণের বীজ এল এবং শুরু হলো খাল নির্ভর সেচ ব্যবস্থা। প্রত্যাশিত খালের জল যখন জমিতে পৌঁছোলো না তখন শুরু হলো মাটির নীচ থেকে জল তোলা। সেই যে মাটির নীচ থেকে জল তোলা শুরু হলো তার ফলশ্রুতির কথা আমরা জানি। মাটির নীচে জলস্তর যতটা বর্ষায় পূরণ হয় তার চেয়ে অনেক বেশি জল তোলা হয়ে গেল। ফলে মাটির নীচের জল অনেক বেশি নীচে নামতে আরম্ভ করল। এবং যে জলস্তর শুখা মরশুমে নদীকে সজীব রাখত— সেই জলস্তরটা আস্তে আস্তে উধাও হয়ে গেল। নদী শুকোতে আরম্ভ করল। সাম্প্রতিক এক সরকারি সমীক্ষা থেকে জানা গেছে, রাজ্যের ১৭৩টি ব্লকে মাটির নীচের জলস্তর প্রতি বছর ২০ সেন্টিমিটারের বেশি হারে নেমে যাচ্ছে, আরও জানা গেছে ৮১টি ব্লক আর্সেনিকে বিষাক্ত, ৪৯টা ব্লক ফ্লোরাইডে বিষাক্ত। আর সবচেয়ে ভয়ঙ্কর কথা, এই জল যখন সেচের কাজে ব্যবহার হচ্ছে, তখন তা খাদ্যশৃঙ্খলে ঢুকে পড়ছে। এখন, সবজিতে বিষ, ধানে বিষ, দুধে বিষ, ফলে শিশুর দেহেও বিষ।

এই বাংলায় যত বৃষ্টি হয় সেটা হরিয়ানা বা পাঞ্জাবের তুলনায় প্রায় তিনগুণ, কিন্তু এখানেও একটা পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। সম্প্রতি, গত একশো বছরের বৃষ্টিপাতের একটা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করছিলাম আমি। দেখছি, ১৯০১ থেকে ২০০২, এই সময়ে জুন মাসের বৃষ্টিটা প্রায় ৪৮ মিলিমিটার কমেছে আর সেপ্টেম্বর মাসের বৃষ্টি প্রায় সমপরিমাণে বেড়েছে, তার মানে কৃষকের কাছে এটা একটা গভীরতর সংকট।

কৃষকরা মে মাসে বীজতলা তৈরি করে। বীজতলা তৈরি করে অপেক্ষা করে, কখন বৃষ্টিটা নামবে। জুন মাসের বৃষ্টিটা কম হলে তিনি ধানচারা রোপণ করতে পারেন না। ফলে খারিফ চাষ গত চার বছরে— কোনো না কোনো ভাবে দেরি হয়েছে। আমার মনে হয়, এটা এই সময়ের সবচেয়ে বড়ো সংকট।

বৃষ্টিপাতের ছন্দ বিঘ্নিত হওয়ার ফলে বিপন্ন আমাদের কৃষি অর্থনীতি। বদলে যাওয়া বৃষ্টিপাতের সময় সারণির সঙ্গে ফসল রোপণের সময় সারণি মিলিয়ে নেওয়াই— এই সময়ের চ্যালেঞ্জ। □

বাণিজ্যিক নয় মানবিক

স্বাস্থ্যের বৃত্তে

স্বাস্থ্য, রোগ, চিকিৎসা, বিজ্ঞান ও সমাজ নিয়ে আপনার সহমর্মী
দ্বিমাসিক বাংলা পত্রিকা

প্রাপ্তিস্থান : পাতিরাম, বুকমার্ক, পিপলস বুক সোসাইটি, বইচিত্র (কলেজ স্ট্রিট)
পাভলভ মেডিক্যাল রিসার্চ সেন্টার (মহাত্মা গান্ধী রোড) অমর কোলের স্টল (বিবাদি বাগ) অম্লান দত্ত বুক স্টল (বিধান নগর পুরসভা)
শ্রমিক কৃষক মৈত্রী স্বাস্থ্য কেন্দ্র (চেঙ্গাইল), হাওড়া ও শিয়ালদহ সেকশনের বিভিন্ন বইয়ের স্টল।
গ্রাহক চাঁদা : ১৫০ টাকা (ডাকখরচ সহ। কলকাতার বাইরের চেকের জন্যে অতিরিক্ত ৩০ টাকা)।
পাঠক ও এজেন্ট রা যোগাযোগ করুন : ৯৮৩০ ৯২২১৯৪ বা ৯৩৩১ ০১২৫৩৭

এত নিশ্চিন্তে ভূগর্ভস্থ জল তোলা যাবে না

ধ্রুবজ্যোতি ঘোষ

দারিদ্র্য কমানোর নতুন পথের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। এই পথ ধরে হাঁটলে পশ্চিম বাংলার গরিব চাষিদের দারিদ্র্য কমে যাবে। ইন্টারন্যাশনাল ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউটের গবেষণার উপরে ভিত্তি করে এই পথের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। ছোটো ছোটো পাম্পের সাহায্যে যত ইচ্ছে জল তোলো আর তাতে বোরো চাষ করো।

জল আছে কি নেই তা বিশেষজ্ঞের থেকে যাঁরা জল তোলেন তাঁরাই ভালো বোঝেন। বছরের পর বছর নীচু থেকে আরও নীচুতে গিয়ে মাটির তলার জল তোলার জন্য যখন হিম্‌শিম্‌ খেতে হয়, তখন অঙ্ক কষে জল বার করার কেরামতিটা না দেখালেই ভালো হতো। ভাবতে অবাক লাগে যে, আজও নিশ্চিন্তে মাটির তলা থেকে জল তোলার কথা বলা সম্ভব। যোজনা কমিশনের সদস্য মিহির শাহ্‌ বলেছেন যে ৭৫ শতাংশ সেচের কাজ মাটির তলার জল তুলে হয়েছে, চাষিরা প্রতিযোগিতা করে মাটির তলা থেকে জল বের করে নিয়েছেন এবং এর ফলে ভূগর্ভস্থ জলের চরম সংকট দেখা দিচ্ছে।

এমন নয় যে যথেচ্ছ তুলে দেখতে হবে যে, ফলাফল কেমন হয়। বিজ্ঞান আছে তো। দৃষ্টান্ত আছে তো। ভারতের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে যথেচ্ছ জল তুলে কৃষিকার্য করার ফলে যে ভয়াবহ পরিণতি হয়েছে তা বিজ্ঞানীরা সবিস্তারে দেখিয়েছেন। আগুনে হাত দিলে হাত পোড়ে, তা বুঝতে শিশুরা উৎসাহ দেখাতে পারে। তা বলে বড়োরাও? উদ্দেশ্য বোঝা গেল না।

উৎপাদনসর্বস্ব কৃষি উন্নয়নের ভয়াবহতা আজ বহু আলোচিত। নর্মাল বোরলগের সবুজ বিপ্লব যে সাময়িক ভাবে সাড়া জাগিয়েছিল, আজ সেই সবুজ বিপ্লবই ভারতীয় কৃষির কোমর ভেঙে দিয়েছে। পাঞ্জাব-হরিয়ানা-উত্তরপ্রদেশ, যে সব রাজ্যে সবুজ বিপ্লবই ভারতীয় কৃষির কোমর ভেঙে দিয়েছে। পাঞ্জাব-হরিয়ানা-উত্তরপ্রদেশ, যে সব রাজ্যে সবুজ বিপ্লব সবচেয়ে বেশি সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল, আজ সেই সব এলাকা গুরুতর অর্থনৈতিক এবং পরিবেশ সংক্রান্ত দুর্গতির কবলে। একথা বলেছেন বিখ্যাত কৃষিবিজ্ঞানী এম এস স্বামীনাথন। আমরা জানি, উনিই ছিলেন ভারতে সবুজ বিপ্লবের কর্ণধার। আমরা জেগে ঘুমোচ্ছি। মাটিতে প্রাণ নেই। অসীম শ্রীবাস্তব এবং আশিস কোঠারী-র লেখা *Churning the Earth* এই বহুল সমাদৃত বইয়ে সবুজ বিপ্লবের ভয়াবহতা সবিস্তারে আলোচনা করা আছে। এই অল্প-পরিসরে সেই আলোচনা দু'বার করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু সেই সব শিক্ষা না নিয়ে যাঁরা রাম-দুই-তিন গুনতে গুনতে প্রথম সবুজ বিপ্লব থেকে দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লবের কথা ভেবে বিভোর হয়ে ওঠেন, তাদের নিয়ে চিন্তা হয়।

দেখা যাক ভূগর্ভস্থ জল ইচ্ছে মতন তুললে আর্সেনিক সমস্যা কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়। প্রথম মনে রাখতে হবে যে, আর্সেনিক সমস্যাটা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই, প্রতিদিন বাড়ছে। ১৯৮২ সালে পশ্চিমবঙ্গের মাত্র দু'টি গ্রামে আর্সেনিক পাওয়া গিয়েছিল। এর পর, রাজ্যের ২২ লক্ষ টিউব-ওয়েলের মধ্যে ১.৪ লক্ষ টিউবওয়েলের উপরে পরীক্ষা চালিয়ে School of Environmental Studies তাঁদের গবেষণাপত্রে জানিয়েছিলেন যে, পশ্চিমবঙ্গে তাদের সীমাবদ্ধ সমীক্ষার ভিত্তিতে ৩৪১৭টি গ্রামের নলকূপের জলে লিটার প্রতি ৫০ মাইক্রোগ্রামের বেশি আর্সেনিক পাওয়া গিয়েছিল। এই ফলাফলটির সবচেয়ে বড়ো ফাঁক এইখানে যে, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্ধারিত এই বিষয়ে সীমাঙ্ক হলো লিটার প্রতি ১০ মাইক্রোগ্রাম। Bureau of Indian Standards এই সীমাঙ্ক ব্যবহারেরই পক্ষে। বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণায় জানা গিয়েছে যে, চাষের জন্য জল তুলে নেওয়ার ফলে ভূগর্ভস্থ জলে আর্সেনিকের পরিমাণ বাড়তে থাকে। পরীক্ষা থেকে আরও প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে, আগে যে নলকূপের জল আর্সেনিকমুক্ত ছিল, পরে সেই নলকূপেই আর্সেনিক পাওয়া গিয়েছে। আর্সেনিকের আলোচনা এখানে আর নিয়ে যাবার জায়গা হবে না। কিন্তু তবু যেটা বলতে হবে, অত্যন্ত রক্ষণশীল ভাবে হিসেব করলেও পশ্চিমবঙ্গের ৫০ শতাংশ গ্রাম আজ আর্সেনিক সমস্যার মুখোমুখি।

এবং ফ্লোরাইড দূষণ

এর পরে ফ্লোরাইড দূষণের কথা আলোচনা করতে হবে। Fluorosis হলো ভারতের ভূগর্ভস্থ জল-সংক্রান্ত রোগের মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যায় নথিভুক্ত। এ-দেশের ২৮টি রাজ্যের মধ্যে ২০টি রাজ্যে এই রোগের সংক্রমণ দেখা যাচ্ছে। এই মুহূর্তে ২০টি রাজ্যে Fluorosis রোগে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা ৬২০ লক্ষ, যার মধ্যে ১৪০ লক্ষ হলো শিশু। এই সমস্যার মোকাবিলায় পশ্চিমবঙ্গে ফ্লোরাইড টাস্ক ফোর্স তৈরি করা হয়েছে।

এটা আনন্দের কথা যে, পশ্চিমবঙ্গের কৃষি দপ্তর বোরো চাষের এলাকা কমানোর কাজে লেগে পড়েছেন। বছরের পর বছর বোরো চাষ করে শুধু কৃষকই যে সর্বস্বান্ত হচ্ছেন তা নয়, যে আলোচনা খুব কম হয় তা হলো, মাটিও সর্বস্বান্ত হয়ে যাচ্ছে। বছরের পর বছর এক নাগাড়ে আমন-বোরো চাষ করার ফলে মাটি দীর্ঘদিন জলের তলায় থাকে। এর ফলে মাটির মধ্যে জীবাণু-চক্রই পাল্টে যায়। প্রথম প্রথম মাটি ধান ছাড়া আর কিছুই ফলাতে পারে না, তার পরে ধানও পারে না। মাটি তখন অকেজো হয়ে যায়। এই মাটিকে ফলনশীল করা প্রায় অসম্ভব।

পশ্চিমবঙ্গের চাষি সাধারণ ভাবে সকলেই গরিব এমন নয়। কিন্তু বোরো চাষিরাই যে ক্রমশ গরিব হয়ে যাচ্ছেন এতে কোনো সন্দেহ নেই। প্রশ্নটা এখানেই। যাঁরা বোরো চাষ করেন তাঁরা বিকল্প খুঁজছেন। গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয়তা হলো

তাঁদের উপযুক্ত বিকল্পের সন্ধান দেওয়া। কৃষক সংগঠনগুলি এই চাষের সমস্যাটা বুঝে বোরো চাষিদের পাশে দাঁড়ালে ভালো হয়। এটাও মনে করিয়ে দেওয়া দরকার যে, কী ভাবে পশ্চিমবঙ্গে সুষম চাষ করতে হবে তার সর্বশ্রেষ্ঠ নির্দেশাবলী পাওয়া যাবে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কৃষি কমিশনের ২০০৯ সালে প্রকাশিত রিপোর্টে।

ভূগর্ভস্থ জলের গবেষণা গুরুত্বপূর্ণ। জলের পরিমাপ ও গুণগত মান নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে কোনো প্রশ্নও নেই। কিন্তু সেই জল কৃষিকার্যে লাগার ক্ষেত্রে কোনো মন্তব্য করতে হলে সর্বদাই বর্ষার জল তথা মাটির উপরের সমস্ত জলের উৎসকে সঙ্গে রেখেই করতে হবে। এই কথাটা নতুন নয়। গবেষকরা ভুলে গেলে মনে করিয়ে দিতে হবে।

ঐতিহাসিক ভাবে জলাভূমি সংরক্ষণ আর সুষম চাষ-বাস অসম্ভব গুরুত্বের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী হয়ে গিয়েছে আজ। এই যোগাযোগ এখনও সবাই ভালো করে বুঝতে পারছেন তা মনে হয় না। আমার কথা, পশ্চিমবঙ্গই প্রথম রাজ্য যাতে জলাভূমি নীতি প্রচলিত হতে চলেছে। কোনো জলাভূমি বা জলাশয়, তা সে যত ছোটোই হোক, বোজানো যাবে না। বিশেষজ্ঞরা একথাই সুপারিশ করেছেন। এখানেও সমস্যা আছে। জলাভূমিকে খালি জমিতে (ক্ষেতের জমিতে) পাল্টে ফেলার, বুজিয়ে ফেলার যে কারুকার্য তা স্বেচ্ছাচারীরা রপ্ত করে ফেলেছেন। এর পর কাজটা সোজা। বাড়ি-ঘর-কারখানা তৈরি করতে আর কোনো আইনী অসুবিধে নেই। এর প্রতিবিধানের কথা জলাভূমি নীতিতে যাই থাকুক না কেন, ভরাট বাঁচানোর একমাত্র শক্তি হলো এলাকার মানুষের প্রতিরোধ এবং তার সাথে প্রশাসনের স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট সাহায্য। সমস্যা হলো এই যে, প্রশাসনের কোনো স্তরেই জলাভূমি সংরক্ষণ করার প্রশিক্ষণের কোনো ব্যবস্থা নেই। এই সমস্ত ঘাটতি পূরণ করতে না পারলে জলাভূমি সংরক্ষণ সদিচ্ছাই থেকে যাবে। কৃষক নাগাল পাবেন না এই নিরাপদ জলের উৎস।

বস্তুত, জলের জোগান বাড়তে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বর্ষার জল ধরে রাখার যে ডাক দিয়েছেন তা অত্যন্ত সঙ্গতিপূর্ণ এবং সময়োপযোগী। পশ্চিমবঙ্গে জল নিয়ে আলোচনা হবে আর তাতে নদী-নালা-খাল-বিল-পুকুর থাকবে না তা ভাবতেই অবাক লাগে। কিন্তু এখানেই মস্ত বড়ো সমস্যা হাজির হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের অনেক জায়গায় বিশেষত শহরের আশেপাশে জলাভূমি ভরাট হয়ে যাচ্ছে। কিছুতেই আটকানো যাচ্ছে না।

অন্য আর একটা সমস্যা হলো পুকুর কাটার কাজ অনেক জায়গায় হচ্ছে বটে, কিন্তু ভালো ভাবে হচ্ছে না। কোথাও কোথাও ভুল ভাবেও হচ্ছে। ভালো কাজের বেশ কিছু নিদর্শন আছে। প্রথমে মনে পড়ে বাঁকুড়া জেলার হিড়বাঁধ ব্লকের কথা। এখানে ১৬৪৮টি পুকুর নিখুঁত ভাবে কাটা হয়েছিল। ঝগড়াঝাঁটি হয়নি। গ্রামের আয় এবং সমৃদ্ধি বেড়েছে। এই সবেরই হিসেব রাখা হয়েছে। কিন্তু একেবারে ভুল ভাবে টাকা খরচ হয়েছে, হয়তো এই দৃষ্টান্ত অনেক বেশি। আশা করব চেহারাটা পাল্টাবে।

বর্ষার জল ধরতে পারলে ভূগর্ভস্থ জলের উপর চাপ দেওয়ার দরকার পড়বে না। আর্সেনিকের বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। কৃষক কিছুটা নিশ্চিন্তে বাঁচবেন। তুলনামূলক ভবে নীরোগ থাকবেন। দারিদ্র্য যদি নাও কমে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : *এই সময়*, ১২ ডিসেম্বর ২০১২।

দুর্বার প্রকাশনী - র কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বই

অধিকার ভাবনা সম্পাদনা : **শুভেন্দু দাশগুপ্ত ও স্মরজিৎ জানা** দাম : ৮০ টাকা

নারী ভাবনার বাইশ কথা সম্পাদনা : **তরুণ বসু ও ভারতী দে** দাম : ১০০ টাকা

চেনা দেশ অচেনা মানুষ **স্মরজিৎ জানা** দাম ২০০ টাকা

ভিন্ন নারী অন্য স্বর **তরুণ বসু** দাম ৪০ টাকা

সমাজ সমস্যার সাতসতেরো **স্মরজিৎ জানা** দাম ১৯৫ টাকা

কখনও জিত কখনও হার সম্পাদনা : **স্মরজিৎ জানা, মৃণালকান্তি দত্ত** দাম : ৩০০ টাকা

ONLY RIGHTS CAN STOP THE WRONG Rs 50.00

BABUDER ANDAR MAHAL **Mrinal Kanti Datta** Rs 50

পাওয়া যাবে :

দুর্বার প্রকাশনী, ৪৪ বলরাম দে স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০০৬-এ।

এ ছাড়াও কলেজ স্ট্রিটে দে বুক স্টোর, মণীষা গ্রন্থালয়। মেদিনীপুরে ভুর্জপত্র। শান্তিনিকেতনে সুবর্ণরেখা। ও অন্যত্র।

সহজ মানুষ, সভ্য মানুষ ও চিট ফান্ড

ব্রতীন চট্টোপাধ্যায়

মানুষ তো সেই কবে থেকে সঞ্চয় করে আসছে। দিন আনি দিন খাই জীবনযাপনের আদিমতা থেকে আগামী কালের জন্য কিছু বাঁচিয়ে রাখার ভাবনাই মানুষকে এই বর্তমানে এনেছে। সঞ্চয়, মানুষের আদিম প্রবৃত্তি। সেই গুহাবাসী মানুষ থেকে আজকের দিন পর্যন্ত। আগামীর ভাবনাই তো সভ্যতা। সভ্য সমাজ তাই কালকের জন্য সঞ্চয়ের অভ্যাসকে কেবলই পালিশ করে করে এমন এক অবস্থায় এনেছে যেখানে ঘরবাড়ি তো বটেই এমনকি মোবাইল ফোনের প্রয়োজনকে এই সঞ্চয়ের মশারির মধ্যে ধরে ফেলেছে— আজ কিনে, আজকের প্রয়োজন মেটাও, কাল দাম দিও। সঞ্চয় নয়, অর্থাৎ জমাও তারপর খরচ করো নয় বরং আজ খরচ করো কাল দাম দিও--- পোস্টপেডই হলো এই আধুনিক জীবনযাপনের মহামন্ত্র। এই মন্ত্র জপ করতে বসার আগে আচমন করতে হয়, তার আবার বিশেষ উপচার রয়েছে, কাল যে দাম দেব— কাল যে দাম দেবার যোগ্যতা থাকবে তার নিশ্চয়তা বা সম্ভাবনার নিশ্চয়তা। ইএমআই-এর বদান্যতায়, আজ-কেন-কাল-দাম-এর সৌজন্যে আজ যে ফ্ল্যাট বাড়িতে গৃহপ্রবেশ করলাম তার দাম জোগাবে আমার নিয়মিত মাইনের নিরাপত্তা। আমার মাইনের নিরাপত্তাকে আবার নিশ্চিত করছে আপিসে আমার যোগ্যতা, মালিকের আমার ওপর বিশ্বস্ততা। ফ্ল্যাটবাড়ি, আমাকে দিয়ে মাসে মাসে ইএমআই নিশ্চিত করবার জন্য আমাকে যে অদৃশ্য দাসখত লিখিয়ে নিল আমার জীবনযাপন তাই এবার থেকে আমাকে নিয়ন্ত্রণ করবে, করছে। গোটা সমাজ, এই আজ-কেন-কাল-দামে-র জীবনযাপনের মন্ত্রে মজে তার আগামীকালকে মর্টগেজ করে বসে আছে।

একটু ভুল বললাম বোধহয়, গোটা সমাজ নয়— খবরের কাগজে যে মানুষগুলোর ছবি হঠাৎ সামনে আসতে শুরু করেছে তারা তেমন আধুনিক হয়ে উঠতে পারেনি, তারা এখনও দিন-আনি-দিন-খাই স্তরেই রয়ে গেছে, আগামীকালের আর্থিক ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করবার মতো সভ্য হয়ে উঠতে পারেনি। কিন্তু তাই বলে কি তারাও চিরকাল 'অ-সভ্য'ই থেকে যাবে? সভ্যদেশে সভ্য সরকার রয়েছে, সাংবিধানিক সরকারের দায়িত্ব সকলকে সমান অধিকার দেওয়া, সকলেরই তো ভোট দেবার অধিকার রয়েছে— এদের সংখ্যাও কম নয়। তাদের সভ্য করার দায়ে সরকারকেই এগিয়ে আসতে হচ্ছে, সকলকেই আজ-ধার-কাল-নগদের সভ্যতার আওতায় আনার জন্য নানাবিধ পরিকল্পনা করতে হচ্ছে। অবধারিত ভাবে, তার জন্য দরকার আয়বৃদ্ধি। জীবনযাপনের ন্যূনতম যা তার থেকে একটু বেশি। এই হিসাব করতে খুব যে একটা ত্রৈরাশিক বা ভগ্নাংশ-র দরকার তা নয়— প্রথমেই জানতে হবে জীবনযাপনের জন্য ন্যূনতম আয় কতটা দরকার, আর তারপর তার থেকে 'একটু বেশি'র জোগান তো ওই আজ-ধার-কাল-নগদের মন্ত্র জপ করার মশারির মধ্যে এনে ফেলা যাবে। এই সব মানুষ জন্ম নেয় তাদের পিতামাতার ইচ্ছায়, বেঁচে থাকে বেঁচে থাকার জন্য আর মরে পারিবারিক কারণে, সেও এক অর্থে নিজেরই ইচ্ছায়— আলু বা তুলো চাষি বা চিট ফান্ডের আমানতকারী কিংবা এজেন্টরা তো নিজের ইচ্ছাতেই আত্মহত্যা করে। ভুল বললাম বোধহয়, নিজের কর্মফলেই মরে— চাষ করেছিল কেন? চিট ফান্ডে টাকা রেখেছিল কেন?

কিন্তু ওই যে সভ্যতা—আজ ধার-কাল-নগদের মন্ত্র, তাকে বাদ দিই কি করে! আজ-নগদ-কাল-ধারের আদিমতা থেকে উন্নত হবার ইচ্ছাকে বাদ দিই কি করে? ইচ্ছা নিজেই তো একটা মন্ত্র। লোকে, দেশের এবং এই রাজ্যের বেশির ভাগ দিন-আনি-দিন-খাই লোকেদের জীবনযাপনকে উন্নত করবার দায় নিয়ে সাংবিধানিক সরকার 'একটু বেশি' উপার্জনের জন্য প্রতিবছর যে বিপুল অর্থ সরবরাহ করছেন, তা সাধারণ লোকের কাছে একটা সংখ্যা মাত্র। সেই সংখ্যা কি ভাবে ওই সব মানুষের দুপুরের খাবার সময় গরম ভাত হয়ে ওঠে, শীতের রাতে কাঁথা হয়ে ওঠে তার সন্ধান অজানাই থেকে যায়; তবে সেটা না জানলেও ওই সংখ্যা নিয়ে উরু চাপড়ে আস্ফালনের কোনো কমতি হয় না। যে যুবকটি এইমাত্র প্রখ্যাত আর্থিক-বাণিজ্য সংস্থায় চাকরিতে যোগ দিলেন তাঁর যোগ্যতা, আয় ও আগামীদিনে উপার্জনের সম্ভাবনা যোগাযোগের এই অভূতপূর্ব সভ্যতায় কয়েক ঘণ্টাতেই পৌঁছে গেছে সেই সব সংস্থায় যাঁরা আজ-ধার-কাল-নগদের মন্ত্র বিক্রি করে। আর কয়েক ঘণ্টায়, আর কয়েক দিন, মাসের মধ্যেই এই যুবকটিও সেই একই মন্ত্র জপ করবেন। তার জীবনযাত্রায়, সেই মন্ত্র উচ্চকিত নাদে ঘোষিত হবে, সেই নাদ আরেকটি যুবককেও লুব্ধ করবে ওই একই মন্ত্র জপ করতে, তারও ওই রকম একটা আর্থিক নিরাপত্তা দরকার। প্রত্যেকের এই নিরাপত্তার দরকার— সভ্য এবং তত-সভ্য নয় এমন প্রত্যেকেরই। নিরাপত্তার এই দুর্যোগে কে দেবে আশা, কে দেবে ভরসা? দেবে নির্বাচিত সরকার আর তার দোহারকি করবে বে-সরকার, দুয়ে মিলে পিপিপি মডেল।

সভ্য অর্থাৎ যাঁদের হাতে এবং মগজে আর্থিক নিরাপত্তা অর্জন করবার কৌশল জন্মগত, তাঁদের সভ্যতার মন্ত্র পড়ানোর যজমানেরা পিপিপি মডেলে সরকারের বিধি-নিয়মে আবদ্ধ, সরকারই তাদের নিরাপত্তার রক্ষাকবচ। কিন্তু, যাঁরা তেমন-সভ্য হয়ে উঠতে পারেননি, জন্মগত ভাবে সভ্যতার কৌশল রপ্ত করার তেমন সুযোগ পাননি— ব্যাংক বা পোস্টাপিস কি কাজে লাগে, কি ভাবে ওপর থেকে নীচে নেমে আসে, কেন টাকায় সেই কাগজের বিনিময়ে সমমূল্য ফেরত দেওয়ার

আশ্বাসবাণী লেখা থাকে সেই সব তেমন ভাবে জেনে ওঠা হয়নি। তবে জেনে ওঠা হয়নি বলে কি তাঁরা সভ্যতার মন্ত্র থেকে বঞ্চিতই থেকে যাবেন? তাঁদের জন্য অন্য ব্যবস্থা, এই ব্যবস্থা নীচে থেকে— কাকা, আমি নিরাপত্তা দিচ্ছি, মাসী আমি টাকা ফেরত দেব তোমাকে— এই সব এজেন্টরাই টাকার কাগজে লেখা আশ্বাসবাণী—ব্যক্তিগত সম্পর্কের বিশ্বস্ততাকে গচ্ছিত রেখেই এই আমানতের শুরু। ব্যাংক বা পোস্টাপিসের থেকে সুদের হার বেশি বা কম এই সব প্রশ্নের থেকে গচ্ছিত বিশ্বস্ততার মূল্য কম নয়। আমানত, এই তৃণমূল থেকে ক্রমশ অপসারিত হতে হতে এক আশ্চর্য বাড়িতে গিয়ে প্রবেশ করে। সেখানে আমানতকারী একটা পরিচয়বাহী সংখ্যা মাত্র। এই সব সংখ্যার যোগফল এমন একটা সংখ্যামানে গিয়ে পৌঁছোয় যে তা কি ভাবে মাথার ওপর প্লাস্টিকের ছাউনিকে টালির ছাতে পরিণত করবে বা মেয়ের জামাইকে সাইকেল কিনে দেবে তার হদিশ দেয় না। ওই বাড়িটাতেই, সেই যুবকটা নতুন কাজে যোগ দিয়ে সভ্যতার নব-মন্ত্র জপছে, তার মন্ত্রনাদ শুনে অন্য যুবকটি লুব্ধ। আজ-ধার- কাল-নগদের সম্যক চক্র সম্পূর্ণ হলো। যে সভ্য, যে ততটা সভ্য নয় সকলকেই এই মহামন্ত্রের মশারির মধ্যে টেনে আনার সাম্যে কেবল বাদ রইল যারা মশারির বাইরে— যারা এই মহামন্ত্রের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করবার মতো সভ্য হয়ে উঠতে পারেনি। তাঁরা সংখ্যায় এত কম, তাঁদের কণ্ঠস্বর এতই ক্ষীণ যে তা শোনাই যায় না। শোনা যায় তাঁদেরই স্বর, নাদ হয়ে সেই স্বর অবিশ্বাসীদের স্তব্ধ করে দেওয়ার মতো শক্তিশালী। এই সভ্যতা, যাকে মিডিয়া বলে তার মতো উচ্চনাদ আর কার? মিডিয়ায় প্লাস্টিকের ছাউনির পরিবর্তন করে টালির ছাদের ইচ্ছার, সেই বৃদ্ধার কণ্ঠস্বর শুনবার চাইতে সেই সব 'স্বনামধন্য'দের কণ্ঠস্বরই শুনতে চাইব। তাঁরা তো আর সহজ মানুষ নন; এই সব অ-সহজ মানুষেরাও তো ওই মন্ত্রে দীক্ষিত; তাঁরাই তো মন্ত্রের নির্বাচিত প্রচারক।

যে কথা হচ্ছিল— সাংবিধানিক সরকার আয় বাড়াবার বিপুল উদ্যোগ নিয়েছেন। মানুষ বাঁচে, বাঁচতে চায়— গাছের পাতা, বনের কন্দ খুঁড়ে খায়, বাঁচতে চায় বলে। বিপুল উদ্যোগ চুঁইয়ে পড়ে তার পাতেও। চুঁইয়ে না পড়লে তা আবার নির্বাচনী ইস্তাহার হয়ে মিডিয়ার চর্চার কেন্দ্র হয়ে উঠবে। সদ্য নিয়োজিত সেই যুবকের পকেটের দিকে যে নজর রয়েছে, তা আমরা জানতাম কিন্তু সেই নজর যে রয়েছে এই চুঁইয়ে পড়া বিন্দুর প্রতিও, তা অনেকেই জানতেন না। তবে, যাদব মিস্ত্রি বা জ্যোৎস্নাদির ঝুলি থেকে সেই চুঁইয়ে পড়া বিন্দু সংগ্রহ করে সিন্ধুতে পরিণত করার ইচ্ছা অনেকেরই ছিল, অনেকেরই আছে। যে অর্থ চুঁইয়ে পড়ছে তার হিসাব সরকারি দস্তাবেজ-এ থাকে, তা নিয়ে কেতাবি অর্থনীতির চর্চা চলে। কিন্তু সরকারি দস্তাবেজ-এ যে সব বিন্দু বা সিন্ধুর হিসাব থাকে না, কেতাবি অর্থনীতি তা নিয়ে চর্চাও করে না। কেতাবি অর্থনীতি যা বাস্তবিক, যা দৃশ্যমান তারই চর্চা করে কিন্তু এই সব বিন্দু বা সিন্ধুর হিসাব দৃশ্যমানও নয়, বাস্তবিকও নয়—তাই এই আগামীর অবাস্তবতা, ভার্চুয়াল রিয়েলিটির মধ্যেই নিহিত। সরকারি আর্থিক অনুদান, ভর্তুকি বা ন্যূনতম মজুরির বরাদ্দ যা আয় বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে 'একটু বেশি'র জন্য সংকল্পিত তাই সভ্যতার মন্ত্রের উচ্চনাদ আহ্বানে অপসৃয়মান, ভার্চুয়াল বাস্তবে পরিণত। সে অল্প পরিমাণ নয়। বেহিসাব সেই অর্থের সংখ্যামান স্ফীত হতে হতে দেশের/রাজ্যের অর্থনীতিকেই— খাচ্ছি তবু গিলছি না অথবা খাচ্ছি কিন্তু পুষ্টি হচ্ছে না-র পরিস্থিতিতে নিয়ে যাওয়ার অবস্থা তৈরি করেছে, করছে। এর ফলাফল কি? দেখে তো মনে হচ্ছে—'কে মেরেছে, কে মেরেছে...দাদার হাতে কলম ছিল ছুঁড়ে মেরেছে' টাইপের কাজিয়া। সে কাজিয়ার গোড়ায় রয়েছে রাজনৈতিক দল/নেতাদের প্রতিষ্ঠার, নিরাপত্তার প্রশ্ন; কিন্তু সকলেই তো আর দল/নেতা নয়?

মিডিয়া-য় যাঁদের বলা হয় 'সাধারণ মানুষ' তাঁদের নিরাপত্তার কি হবে? দেশ/রাজ্যের আর্থিক বাজার থেকে এত বিরাট সংখ্যামানের অর্থ অদৃশ্য হয়ে গেলে, তা কোন্ ভবিষ্যতের নিরাপত্তা দেবে— চাকরিতে যোগ দেওয়া সেই যুবকটির, এখনও চাকরিতে যোগ না দেওয়া সেই যুবকটির, প্লাস্টিকের ছাউনিকে টালির ছাতে পরিবর্তিত করতে আকুল সেই বৃদ্ধার কোন্ ভবিষ্যতকে নিরাপত্তা দেবে, এই বর্তমান কাল?

বাউল সম্প্রদায় ও তাঁদের বিশ্বাসের জগৎ প্রায় আদিম সভ্যতার স্মৃতি। আজকাল এই বিশ্বাস জনপ্রিয়তার সঙ্গে উদযাপিত হচ্ছে। লালন সাঁই-এর একটা গান মনে পড়ে যাচ্ছে—'বাকি ছেড়ে নগদ পাওনা কে ছাড়ে এই ভুবনে/সহজ মানুষ ভজ রে মন দিব্যজ্ঞানে।' বাউল সভ্যতা, বর্তমানবাদী। ভবিষ্যতের সুদ-এর [যথা : মরিলে বেহস্ত সুখের] চাইতে বর্তমানের আসলকেই বাঞ্ছনীয় মনে করে। তবে, বর্তমান আধুনিক সভ্যতায় 'দিব্য' অথবা 'জ্ঞান' কিংবা 'দিব্যজ্ঞান' এই সব শব্দের অর্থই বা কে জানতে চায়? এই ভুবনে?□

প্র কা শি ত হ য়ে ছে

দুর্বারের কুড়ি বছরের ইতিহাসের এক ঐতিহাসিক দলিল

ক খ ন ও জি ত ক খ ন ও হা র

স ম্পা দ না : **স্মরজিৎ জানা, মৃণালকান্তি দত্ত**

দা ম : তিনশত টাকা

প্রকাশক : দুর্বার প্রকাশনী, ৪৪ বলরাম দে স্ট্রিট

কলকাতা ৭০০ ০০৬।

পাওয়া যাবে : কলেজ স্ট্রিটের বিভিন্ন দোকানে।

যোগাযোগ : ০৩৩ ২৫৪৩ ৬৯৭৫, অথবা ৮৪২০ ০৬৬৫ ৯৪।

প্র কা শি ত হ য়ে ছে

শান্তিনিকেতনের ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ দলিল

অঘোরনাথ নথি সংকলন ও

শান্তিনিকেতন আশ্রম

স ং ক ল ক : **শ্রীলা চট্টোপাধ্যায়, ব্রতীন চট্টোপাধ্যায়**

দা ম : ২৫০ টাকা

প্র কা শ ক : অনুলেখ, ৮, নরসিংহ লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯।

কলেজ স্ট্রিটে পাওয়া যাবে : দে'জ, এনবিএ, সুবর্ণরেখা-য়।

পশ্চিমবঙ্গের শিল্প : স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণা

সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গে শিল্প মানে স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণা। দুর্ভাগ্য হলেও এটা সত্য। স্বাধীনতার পর বছর পনেরো পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের শিল্পমানচিত্র ছিল উজ্জ্বল। ব্রিটিশ আমলে ঔপনিবেশিক পুঁজি এ রাজ্যে যে শিল্পায়ন গড়ে তুলেছিল তাতে মুখ্য ছিল পাট ইঞ্জিনিয়ারিং খনিজ ও ধাতু শিল্প। ব্রিটিশরা দেশ ছাড়ার আগে থেকেই এইসব শিল্পের মালিকানা এসে যায় এ রাজ্যের মাড়োয়ারি ও অবাঙালি ব্যবসায়ীদের হাতে। রাজ্যের পুঁজি তখন অনেকটাই কুক্ষিগত ছিল এই ব্যাবসায়িক সমাজের কাছে। বাঙালি সমাজ সেই সময় থেকেই শিল্প-বাণিজ্যে পিছিয়ে। স্বাধীনতার সময় থেকেই পশ্চিমবঙ্গের শিল্প অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণ বাঙালিরা হারিয়ে ফেলে। পরবর্তীকালেও মাড়োয়ারি ও অবাঙালিদের আধিপত্য সরিয়ে তারা আর নিয়ন্ত্রণ করার মতো অবস্থায় ফিরে আসতে পারে নি। এ রাজ্যের শিল্পায়নে বাঙালির স্বপ্নভঙ্গ সেই থেকেই শুরু।

বাঙালি মানস থেকে শিল্পের প্রতি আগ্রহ সেই থেকেই কমতে থাকে। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকেও পশ্চিমবঙ্গ দেশের মধ্যে শিল্পে ছিল শীর্ষে। সেই কারণেই তার ভাগ্যে জুটতে থাকে কম— আরও কম রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ। ভারতের পিছিয়ে থাকা রাজ্যগুলির উন্নয়নের স্বার্থে স্বাধীন ভারতের নবগঠিত সরকার যখন তাদের জন্য রাষ্ট্রীয় বদান্যতার নীতি গ্রহণ করে তখনও স্বাধীনতার জন্য রক্ত ঝরানো বাঙালি বুঝতে পারে নি কতখানি বঞ্চনা তাদের জন্য অপেক্ষা করছে। ধীরে ধীরে তার কদর্যরূপ প্রকাশিত হয় রাষ্ট্রীয় মোড়কেই। শিল্পক্ষেত্রে লাইসেন্স-অনুমোদন থেকে শুরু করে বৈষম্যমূলক মাসুল সমীকরণ নীতি। উদ্বাস্তু বাঙালিদের প্রতি বঞ্চনার নীতি ক্রমশই এই রাজ্যকে অর্থনৈতিক ভাবে কোণঠাসা করতে থাকে। এই অবস্থায় রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার হাত ধরে পঞ্চাশ-ষাট বা সত্তর দশকে এ রাজ্যে বিক্ষিপ্ত ভাবে যে ভাবে কিছু বৃহৎ শিল্প ইউনিট রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে গড়ে ওঠে পশ্চিমবঙ্গের ভাগ্য তারা বদলে দিতে পারে নি। দুর্গাপুর-কল্যাণীর মতো শিল্পাঞ্চল এই সময় গড়ে উঠলেও দুর্ভাগ্যের কথা এটাই যে সেগুলির প্রাণরস শুকিয়ে যায় দু'এক দশকের মধ্যেই। সেই সময়ে কেন্দ্রীয় শাসককুলের নেতৃত্বে চালু হয়েছিল এক ধরণের রাজনৈতিক অর্থনীতি। দিল্লি থেকে লাইসেন্স পাওয়াটা ছিল বাধ্যতামূলক। নতুন উদ্যোগীরা লাইসেন্স নিতে গেলেই তাদের বলা হতো পশ্চিমবঙ্গ কেন? মহারাষ্ট্রে যান, গুজরাটে যান, কিছু না-হলে তামিলনাড়ু যান। সুযোগ-সুবিধা অনেক বেশি পাবেন। এটি চরম এক বাস্তব অভিজ্ঞতা। স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়লেও দিল্লির রাজনীতিতে কোনোদিনই বাঙালিরা লাগাম হাতে নিতে পারে নি। এমনকি শাসকবর্গের ঘনিষ্ঠ যে দু'চারজন বাঙালি রাজনীতিক ছিলেন, তারাও শাসকবর্গের মনে বাঙালি প্রেম জাগাতে পারে নি।

এক কথায় এটা ছিল বাস্তব সত্য যে, অবাঙালি রাজনীতিকরা শিল্প-বাণিজ্যে বাঙালির উত্থান হোক এটা চায় নি। ফলে অন্য সব রাজ্যের জন্য যেটা ছিল স্বাভাবিক প্রাপ্তি, পশ্চিমবঙ্গে তাই আনতে করতে হতো অস্বাভাবিক লড়াই। স্বাধীনতা-উত্তর রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ নির্ভর শিল্পায়নে তাই এ রাজ্য শুধু বঞ্চিতই থেকেছে তাই নয়, নতুন ভাবে বেসরকারি লগ্নি যাতে খুব একটা না হয় তার জন্যও অবাঙালি দিল্লিওয়ালা রাজনীতিকরা সক্রিয় ছিলেন। স্বাধীনতার পর থেকে কংগ্রেসের দীর্ঘ রাজত্বে এটাই ছিল বাঙালি বঞ্চনার ইতিহাস। রাজনৈতিক অর্থনীতিতে বাঙালিকে কোণঠাসা করার কৌশল। বাংলার শিল্পায়নে স্বপ্নভঙ্গের সেই হলো দ্বিতীয় পর্যায়।

স্বাধীনতার পর দেশে ভূমিসংস্কার ভিত্তিক কৃষি সংস্কার করে তার ভিত্তিতে শিল্পে এগোনোও হয় নি। বরং পুঁজি নির্ভর উন্নয়ন কাঠামো তৈরি করে দেশীয় পুঁজির কাঁধে ভর করে পুঁজিবাদী অর্থনীতির অনুশীলন শুরু হয়। এর ফলে জোর ধাক্কা যায় এ রাজ্য। স্বাধীনতার সময়ে এ রাজ্যের প্রধান শিল্প ছিল পাট। এক দশক পর পাটশিল্পের মালিকরা পুঁজি তুলে স্থানান্তরিত করা শুরু করে অন্য রাজ্যে। তখন থেকেই পিছোতে শুরু করে ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পও যা ছিল এ রাজ্যের আর একটি অন্যতম প্রধান শিল্প। এই পরিবর্তনের কারণ ব্যাবসায়িক পুঁজির মুনাফা কেন্দ্রিকতা। পাটশিল্পের নিয়ন্ত্রণ ছিল মূলত বেনিয়া পুঁজির হাতে। তারা চটজলদি 'ট্রেডিং প্রফিট' চায়। লগ্নির চক্র ছেড়ে বেরিয়ে আসে অনেকেই। স্বাধীনতার পরে শিক্ষা ও বাণিজ্যের বদলে যাওয়া ছকে কীভাবে মুনাফাকে সর্বাধিক করা যায় সেই প্রবণতাতেই তারা এই রাজ্যের শিল্পের লাভ অন্য রাজ্যে লগ্নি করতে থাকে। ফলে এখানকার শিল্প ইউনিয়নগুলির সম্প্রসারণ হয় না। হয় না আধুনিকীকরণ। বাড়তে থাকে উৎপাদন ব্যয়। প্রযুক্তির কারণেও ধীরে ধীরে নতুন শিল্পের সম্ভাবনায় শিল্পপতিরা আকৃষ্ট হয়।

নতুন শিল্প এ রাজ্যেই হতে পারত, হলো না শুধু দিল্লির লাইসেন্স রাজ্য আর মাসুল সমীকরণ নীতির ফাঁসে। সুষম আঞ্চলিক উন্নয়নের নামে ভিন রাজ্যের শিল্পায়নের স্বার্থে ভারত সরকার মাসুল সহ নানা ক্ষেত্রে বহু আর্থিক সুবিধা দিতে থাকল। এ রাজ্যকে দেওয়া হলো না। অবাঙালিদের তো মাটির টান নেই, তাই পুঁজি নিয়ে তারাও অন্যত্র যেতে থাকল। পশ্চিমবঙ্গ স্বাধীন ভারতের শিল্প চিত্রে এক নতুন উপনিবেশে পরিণত হলো। এ রাজ্যের কাঁচামাল আর শিল্পের মুনাফা দিয়ে বাড়তে থাকল অন্যরাজ্যের শিল্প। এ রাজ্যের সংগঠিত শিল্পের বিকাশ এ ভাবেই নতুন লগ্নির অভাবে ক্রমশ ধুঁকতে থাকল। হাওড়ার 'শেফিল্ড' বা দুর্গাপুরের 'রাঢ়' নিয়ে বাঙালি ভুলতে থাকল তার স্বপ্ন। ১৯৬৩ হলো

শেষ বছর। তারপর থেকে এ রাজ্যের শিল্প থেকে আয় কমতে থাকে। আজও সেই ধারা পুরো বদলানো গেল না।

প্রশ্ন উঠতে পারে, এ রাজ্যের পুঁজি শূন্যস্থান পূরণ করতে ছুটে এল না কেন? ঔপনিবেশিক বাংলায় ব্রিটিশ পুঁজির মালিকরা যা করতে পেরেছিল, তাদের তৈরি করা কাঠামোটাকেও বাঙালিরা কেন নিয়ন্ত্রণে আনতে পারল না। অবাঙালিরা যখন এ রাজ্য থেকে শিল্প গুটোচ্ছে তখনও কেন বাঙালি শিল্পোদ্যোগ গড়ে উঠল না ততোধিক পরিমাণে? এর পিছনে মূল কারণ বাঙালির কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিজাত মননের গঠন। শিল্পায়নের জন্য গ্রামের বৃহত্তর সমাজের যে সমর্থন ও মানসিক আগ্রহ দরকার তা কোনোদিনই ছিল না। গ্রামীণ সমাজের পুঁজিকে শিল্পে লাগানোর চ্যানেল তৈরি করতে ব্যর্থ হয় তখনকার সরকার। কৃষি বিকাশের হাত ধরে তাই উদ্বৃত্ত পুঁজি রাজ্যের শিল্পায়নে লগ্নি হতো না। ফিরে যেত ফের জমিতেই। অথবা স্রেফ সোনা বা গেরস্থের সঞ্চয় হিসেবেই জমা থাকত ব্যাংকে। না এ রাজ্যে বিকশিত হতে পেরেছে সংগঠিত শিল্প, না এমনকি শেয়ার বাজার। ভূমিপুত্রদের ভূমি নির্ভরতা না কমাই এর মূল কারণ। বিকশিত হয় নি নগরায়ণ। বরং গ্রাম থেকে মানুষের যে স্রোত কলকাতার দিকে এসেছে, তারা এসেছে কায়িক শ্রমের বিনিময়ে জীবিকা অর্জনে। শিল্প গড়ে ভাগ্য অন্বেষণে গ্রাম থেকে পুঁজি নিয়ে কলকাতায় আসার প্রবণতা বাঙালি সমাজে কখনও মাথা চাড়া দেয় নি। বৃহৎ শিল্প নিয়ে স্বপ্ন গড়ার আকাঙ্ক্ষাটাই ছিল অন্য জাতির অন্য প্রদেশের মানুষদের থেকে কম। এ রাজ্যে তাই কৃষিভিত্তিক শিল্প গড়ে উঠেছে। বাঙালি ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পেও হয়তো হাত পাকিয়েছে। আর শিল্পায়নে নয়, শিল্পকলা নিয়ে আগ্রহ তার মজ্জাগত। সেই উত্তরাধিকার আজও বয়ে চলেছে বর্তমান প্রজন্ম।

শুধু উদ্যোগীদের নিরিখে নয়, পশ্চিমবঙ্গের বৃহৎ সংগঠিত শিল্পে বাঙালিরা শ্রমিক হিসেবেও বিশেষ ভাবে নিয়োজিত হয় নি। তুলনায় অসংগঠিত ছোটো শিল্পে এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে অনেক বেশি মানুষ জীবিকা অর্জনের জন্য নিযুক্ত হয়। জনগণনা থেকে জানা যায়, স্বাধীনতার পর পশ্চিমবঙ্গ যখন শিল্পে দেশের মধ্যে শীর্ষে তখনও সামান্য হলেও বেশি সংখ্যক কর্মী ছিল অসংগঠিত শিল্পে। ১৯৫১ সালের আদমসুমারির তথ্য অনুযায়ী, ওই বছরে এই রাজ্যের সংগঠিত শিল্পে কর্মী ছিলেন ৬ লাখ ৫২ হাজার মানুষ। অসংগঠিত শিল্পের কর্মীসংখ্যা ছিল ৬ লাখ ৬২ হাজার। এরপর থেকে প্রতি দশ বছর অন্তর জনগণনায় দেখা যাচ্ছে, সংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মী বাড়ছে যা, তার থেকে অনেক বেশি বাড়ছে অসংগঠিত ক্ষেত্রে। এরপর তিন দশকে সংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান বেড়েছে। ১৯৬১, ১৯৭১ ও ১৯৮১-তে সেখানে দেখা যাচ্ছে সংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭.১৮ ও ৮.০৯ ও ৮.৯৫ লাখে। কিন্তু ১৯৯১-এ এসে দেখা যাচ্ছে এই ক্ষেত্রে কর্মীর সংখ্যা আর বাড়ে নি। বরং সামান্য হলেও কমেছে (৮.৯০ লাখ)। ওই সময়ে অসংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মীর সংখ্যা বেড়েছে লাফিয়ে লাফিয়ে। ১৯৬১, ১৯৭১, ১৯৮১-তে যথাক্রমে ১১.৬৩, ৯.৩৫, ১৬৫০ লাখ এবং শেষে ১৯৯১-এ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৩.৯৬ লাখে। কারণ অনেক সংগঠিত বৃহৎ শিল্পে এ রাজ্যে লগ্নির সুযোগ যেমন কমেছে, তেমনই ঘটেছিল শ্রমিক অসন্তোষ। একের পর এক কারখানা বন্ধের ঘটনা, ফলে এই ক্ষেত্রে সুযোগ যত দিন গেছে ততই কমেছে— মানুষও জীবিকার টানে ক্ষুদ্র পুঁজি নিয়ে নিজেরা ছোটো ছোটো উদ্যোগ গড়েছে। কৃষিতে উদ্বৃত্ত এভাবেই ছোটো ছোটো আকারে অসংগঠিত ক্ষেত্রের বিকাশে কাজে লেগেছে। পশ্চিমবঙ্গের শিল্পায়নে তৈরি হয়েছে একটি নতুন ছক। বৃহৎ শিল্পের উপর নির্ভর না করেই ছোটো উদ্যোগীরা স্বল্প পুঁজি নিয়ে যে ভাবে উৎপাদন করেছে, তাতে রাজ্যে শিল্পোৎপাদনের সার্বিক বৃদ্ধির হারে দেশের মধ্যে প্রথম সারিতে রয়েছে। অসংগঠিত শিল্পের নিরিখে এই রাজ্য এ ভাবেই সারা দেশে শীর্ষস্থানে এসেছে। ১৯৯০-এর পর এই প্রবণতা আরও স্পষ্ট হয় এবং লাগাতার ভাবে সংগঠিত ক্ষেত্রের তুলনায় অসংগঠিত শিল্পক্ষেত্রের অবদান সব কিছুতেই বাড়তে থাকে। এর ফলে এই রাজ্যের কর্মসংস্থানের সুযোগ কমতে থাকে, কারণ প্রয়োজনের তুলনায় অসংগঠিত ক্ষেত্রের বৃদ্ধি ছিল অপ্রতুল।

পশ্চিমবঙ্গের শিল্প সম্ভাবনা ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে যাওয়ার পিছনে বাঙালিদের শিল্পায়ন বিরোধী মানসিকতা একটি বড়ো কারণ। আসলে এর জন্য যে ধরণের নেতৃত্বের প্রয়োজন ছিল তার অভাব ছিল সুস্পষ্ট। একটা সময়ে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে স্বদেশী শিল্প গড়ার একটা রাজনৈতিক তাগিদ তৈরি হয়েছিল। রাজনীতির চাহিদা মেনে সেই তাগিদ তৈরি হয়েছিল বলে পরে রাজনৈতিক প্রয়োজন ফুরিয়ে যাওয়ার পর তা পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে সঞ্চারিত হয় নি। বরং সমস্যা হলো অন্যদিকে। ব্রিটিশরা ওই ঘটনার পর থেকে ক্রমশ তাদের পুঁজি পশ্চিম ভারতে স্থানান্তরিত করা শুরু করে। স্বাধীনতার পর বাঙালিরা ব্রিটিশ শিল্পায়নের উত্তরাধিকার হিসেবে যে সুযোগ-সুবিধেটা পায় সেটাকে বাড়িয়ে নতুন উচ্চতায় পৌঁছোতে চেষ্টা করে নি। মহারাষ্ট্রে সাহুজি মহারাজের নেতৃত্বে যেমন ব্রাহ্মণ্য বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে চিনিকল সমবায় গঠনের ভিত্তি তৈরি হয়েছিল, ডি. আর গ্যাডগিল যেমন পুণের গোখেল ইনস্টিটিউট থেকেই সমবায় আন্দোলনের একটা ঠাস বুনোট তৈরি করতে পেরেছিলেন যার ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে পরবর্তী কালে মুম্বাইয়ের শিল্প-উত্থানের সূচনা হয়, তেমন কোনো নেতৃত্ব বাঙলায় ছিল না। পরে মহারাষ্ট্রে ওয়াই ডি চহ্বন এবং গুজরাটে মোরারজি দেশাই এই ক্ষেত্রে দুটি উজ্জ্বল নাম। শিল্প-পুঁজি বিকাশে একটি বৃহৎ কাঠামো তৈরি করতে পেরেছিলেন তাঁরা নিজেদের রাজ্যে। স্বাধীনোত্তর ভারতে মাদ্রাজকে ঘিরে যে শিল্পায়ন হয় তার নেতৃত্বে ছিলেন কামরাজ। দলিত শ্রেণিকে শিল্পোদ্যোগে সামিল করায় তিনি আজও প্রবাদপ্রতিম। অন্যদিকে অন্ধ্রপ্রদেশের শিল্পোন্নতির পিছনে কাজ করেছিল অন্ধ্র ব্যাংকের অসীম অবদান। এক্ষেত্রেও পট্টভি সীতারামাইয়ার ভূমিকা ছিল উজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্বরূপ। গ্রামাঞ্চলে শিল্পকে ছড়িয়ে দেওয়ার পিছনে শিল্প-পুঁজি সরবরাহে অন্ধ্র ব্যাংকের নিরবচ্ছিন্ন সহায়তা মূল শক্তি হিসেবে কাজ করেছিল।

দুঃখের ব্যাপার শিল্পে অগ্রণী পশ্চিমবাংলায় না কোনো বাঙালি ব্যক্তিত্ব এমন ভূমিকা পালনে এগিয়ে এলেন, না কোনো বাঙালি ব্যাংক বা শিল্প সংগঠন বাংলাময় শিল্পকে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য ছিল নিবেদিত। ব্রিটিশের প্রতিষ্ঠিত শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি ক্রমে বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর তাই শিল্পায়নে ভাটা এসে যায়। পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী ড. বিধানচন্দ্র রায় অবশ্য কিছুটা চেষ্টা করেছিলেন। শুধু প্রশাসন দিয়ে সে কাজে সাফল্য আসে না। স্তরভিত্তিক শিল্পায়ন না হলে তা কোনো বড়ো শিল্প প্রকল্পকেন্দ্রিক স্থানিক শিল্পোন্নতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। দুর্গাপুরে বা কল্যাণীতে বিধান রায়ের সীমাবদ্ধতা ছিল তেমনই। এর জন্য এগিয়ে আসার কথা ছিল বাংলার তৎকালীন শিল্প সমাজের। তারা

বিধান রায়ের স্বপ্ন পূরণের কথা ভাবে নি। তারা বরং এ রাজ্যে লগ্নিকৃত পুঁজির মুনাফাকে অন্যত্র বিনিয়োগের কথা ভেবেছিলেন। কারণ আদতে তাঁরা কেউ ভূমিপুত্র ছিলেন না।

যাই হোক তবু এদিক-ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে যে ভাবে পশ্চিমবঙ্গে শিল্পায়ন ঘটে তাতে এ-রাজ্যে এক অসম উন্নয়নের ভূগোল তৈরি হয়। খনিজ সমৃদ্ধ এলাকা হওয়া সত্ত্বেও পুরুলিয়া বঞ্চিত হতে থাকে। কমবেশি বঞ্চিত হতে থাকে উত্তরবঙ্গের ছয়টি জেলাই। তুলনায় দক্ষিণবঙ্গে শিল্প স্থাপন হয় অনেক বেশি। এমনিতেই ঔপনিবেশিক আমল থেকেই কলকাতা-হাওড়াকে কেন্দ্র করে হুগলি নদীর দুই পাড়ে যাবতীয় শিল্প-পুঁজির নিবেশ ঘটেছিল। ধীরে ধীরে শিল্পায়নের সম্প্রসারণের স্বার্থে হাওড়ার পশ্চিমে সাঁকরাইলে ও দক্ষিণে উলুবেড়িয়ায় উর্বর কৃষিজমিতে হাত পড়তে থাকে। শিল্পক্ষেত্রে জেলাওয়াড়ি উন্নয়নের বিচারে কলকাতা-হাওড়া বাদ দিলেও দুই মেদিনীপুর, দুই চব্বিশ পরগনা, বর্ধমান, হুগলি, নদীয়া অনেক উন্নত। এর মধ্যে সব থেকে ভালো অবস্থা বর্ধমান ও হুগলিতে। আর সব চাইতে খারাপ অবস্থা বাঁকুড়া, বীরভূম, কোচবিহারের। উত্তরবঙ্গে শিল্প সম্প্রসারণে সব থেকে বড়ো বাধা পরিকাঠামো। যে সড়ক যোগাযোগ সেখানকার একমাত্র ভরসা তার অবস্থা যে কতটা করুণ তা ভুক্তভোগী মাত্রই জানে। এই অসম উন্নয়নের জন্য দায়ী বাম শাসন। বস্তুত পশ্চিমবঙ্গের চাইতে অন্য রাজ্যগুলির এগিয়ে যাওয়ার অনেক কারণ আছে। তবে পশ্চিমবঙ্গের পিছিয়ে যাওয়ার মূল কারণ বামেদের ব্যর্থতা। ১৯৭৭-৭৮ সালে বামফ্রন্ট যখন জ্যোতি বসুর নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গের শাসন ক্ষমতায় আসে তখন সর্বভারতীয় শিল্প চিত্রে এই রাজ্যের স্থান দ্বিতীয়, মহারাষ্ট্রের পরেই। বছর দশেক যেতে না যেতেই পশ্চিমবঙ্গ নেমে এল সপ্তমে। এ রাজ্যে শিল্প সংকট শুরু হয়েছিল ১৯৬৫-তে। তখন থেকেই শুরু হয় ধর্মঘটের জোয়ার। রাজনৈতিক নেতৃত্বে দিকে দিকে তখন শ্রমিক অসন্তোষ আর কারখানায় লকআউট হওয়া শুরু হলো। ক্রমশ লকআউট বাড়তে থাকল। অর্থাৎ মালিকরা উল্টো চাপ দিতে থাকল। বামেরা ক্ষমতায় আসার পর বিপ্লবী ভাবনায় শ্রমিক আন্দোলনকে মদত দিতে থাকে। শিল্পপতিরা রাজ্য ছেড়ে ভয়ে পালাতে শুরু করে। সারা ভারতের শিল্পমহলে বদনাম ছড়িয়ে পড়ে পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে, আর এর সঙ্গে ছিল ভয়ানক লোডশেডিং। সত্তরের গোড়া থেকেই আশির দশকের শেষ পর্যন্ত বিদ্যুতের এই অভাব একটানা চলতে থাকে। বন্ধ হতে থাকে একের পর এক কারখানা। এই সময়ে স্রেফ পশ্চিমবঙ্গ থেকে চলে যাওয়া পুঁজি টেনে শিল্প মানচিত্রে জায়গা করে নিতে থাকে গুজরাট। উত্থান হতে থাকল উত্তরপ্রদেশ ও তামিলনাড়ুর। শিল্পপতিরা যখন অন্যত্র চলে যেতে থাকল তখন থেকেই পশ্চিমবঙ্গের শিল্পে দীর্ঘকালীন অমাবস্যা লাগে। মালিকরাই কোম্পানি বন্ধ করে অন্য রাজ্যেও লগ্নি নিয়ে যাওয়ার জন্য লাগাতার লকআউট ঘোষণা করতে থাকে। ১৯৯৩ সালে দেশের মোট লক আউটের ৮৮.৫ শতাংশই ঘটেছিল পশ্চিমবঙ্গে। এর কারণ হিসেবে কোনো কোনো মহল থেকে বলা হয় যে পশ্চিমবঙ্গের শাসনক্ষমতায় বামেরা থাকার জন্য মজুরি অত্যধিক হয়ে গিয়েছিল। মালিকরা সেজন্য কারখানা বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু এ কথা সত্য নয়। একই দশকের শুরুতে দেখা যাচ্ছে এ রাজ্যের থেকে মহারাষ্ট্র ও গুজরাটে শিল্প শ্রমিকদের মজুরি বেশি। তাহলে সেখানে শিল্পায়ন দ্রুত হারে ঘটল কি ভাবে। অথচ এই রাজ্যে ঘটল কেন? লাইসেন্স রাজ্যের সেই জমানায় এটা ছিল কেন্দ্রের বঞ্চনার ফল। কীভাবে তা আগেই লেখা হয়েছে।

সব মিলিয়ে পশ্চিমবঙ্গের শিল্পে এক নিদারুণ ছবি ফুটে উঠল আশির দশকের শুরু থেকেই। ১৯৬৫ থেকে ১৯৭৫ শিল্প সঙ্কটের প্রথম দশকে বিনিয়োগ কমেছিল লক্ষণীয় ভাবে। এরপর বাম আমলে কম্পিউটার খেদানোর আবহাওয়ায় বন্ধ হলো আধুনিক প্রযুক্তির আসা। এর ফলে যা হয়—নেই পণ্যের বিস্তৃতি, নেই তার বিপণনে উদ্যোগ, কোনো কিছুতেই নেই সরকারি উৎসাহ দান। ফলে গড়ে উঠল না নতুন শিল্প পরিকাঠামো। পুরোনো পরিকাঠামোকেও মেরামত করা হলো না। এমত পরিস্থিতিতে যা হয় তাই-ই হওয়া শুরু হলো। নতুন শিল্প গড়ে ওঠা বন্ধ হলো। পুরোনো শিল্প থেকে পুঁজি তুলে নিয়েছে মালিকরা আগেই। এবার এল ধীরে ধীরে পুরোনোর বন্ধ হওয়ার পালা। শেষপর্যন্ত তাই-ই হলো। পশ্চিমবঙ্গের এক সময়ের ব্যস্ত শিল্পাঞ্চল শ্মশান হয়ে গেল।

এই সময়ে দিগ্‌ভ্রান্ত বাম শাসকরা হঠাৎ মালিকরা তোষণ করা শুরু করলেন। বাম নেতৃবৃন্দ বুঝেছিল যে পুঁজির মালিকদের সঙ্গে বেশি বিরুদ্ধাচারণ হয়ে গেছে বলে হয়তো তারা এ রাজ্য ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। তাই ১৮০° ঘুরে তারাই আবার প্রকারান্তে নানা সুযোগ সুবিধা দেওয়ার কথা ভাবলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে, এ রাজ্যের বামেরা পুঁজিবাদের মর্ম তখনও বাস্তবে বোঝে নি। রাজনৈতিক তোষণ যতই হোক, মুনাফাই আসল কথা। ক্ষয়িষ্ণু শিল্প সম্ভাবনা যেখানে সেখানে শিল্প গড়ার চাইতে শিক্ষা তুলে বেচে দেওয়াটাই তাদের কাছে বেশি লাভজনক এবং বেশি পরিণত ব্যাবসায়িক পদক্ষেপ বলে মনে হতে থাকল। ফলে রাজ্য সরকারের শৈথিল্য আর নরম মনোভাবের জন্য মালিকদের একাংশ পুরো কারখানা তুলে দিয়ে লাভ করতে চাইল বিআইএফআর-এর টাকায়! একের পর এক শিল্প প্রকল্প, কারখানা সেখানে নিয়ে যাওয়াটা ভালো বলে ভেবে নিলেন মালিক পক্ষ। আর টাকার বিনিময়ে কারখানা তুলে দেওয়ার চালাকিও চলতে থাকল। এ এক অন্য লাভের খেলা। সরকারের কাছ থেকে যা পাওয়া যাচ্ছিল, তাতে কারখানা বন্ধ করে দেওয়াতেই লাভ ছিল বেশি। এর পাশাপাশি শুরু হলো শ্রমিকদের প্রাপ্য বকেয়া থেকে বঞ্চিত করার পালা। শ্রমিকদের জমা দেওয়া গ্র্যাচুইটি, প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকাও জমা না দিয়ে আত্মসাৎ শুরু হলো। এরপর বন্ধ কারখানা খোলার জন্য এল সরকার এগিয়ে। কিন্তু আমলা দিয়ে তো শিল্প চলে না। যথারীতি বন্ধ কারখানা ফের বন্ধই হয়ে গেল। আরও 'রুগ্ন' হয়েই। কিন্তু অবাক ব্যাপার, এমন শ্রমদরদী দল হয়েও সরকার চালাতে এসে সিপিআইএম কোনোদিন বন্ধ কারখানা খুলতে কর্মী-সমবায় গঠন করে নি। শুধু তাই নয়, কানোরিয়া জুটমিলের শ্রমিকরা সমবায় গড়ে চালাতে চাইলে, তাতেও অনুমতি দেয় নি রাজ্য সরকার।

বন্ধ কারখানা বন্ধ হওয়া আর বন্ধ কারখানা খোলা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে যে পরিমাণ রাজনীতি হয়েছে তার কিয়দংশ হয়নি কারখানা স্থাপনে নতুন উদ্যোগ নেওয়ার জন্য। এ রাজ্যের শিল্পায়নে বড়ো বাধা দলবাজি রাজনীতির নেতিবাচক মনোবৃত্তি। সমস্যা থাকতেই পারে। কিন্তু সেই সমস্যাকে কাটিয়ে তোলার জন্য সর্বদলীয় উদ্যোগের বদলে হয়েছে কেবল সেই সমস্যাকে জিইয়ে রেখে তা থেকে ঘোলা জলে মাছ ধরার কৌশলে ভোটের রাজনীতিতে এগিয়ে থাকার চেষ্টা। এই কারণেই বন্ধ কারখানা খোলার বদলে বন্ধ কারখানা নিয়ে রাজনীতি হয়েছে অনেক বেশি। কাজ হারানো শ্রমিকদের কারখানায় ফিরিয়ে দেওয়ার বদলে

তাদের দলীয় অফিসে টেনে এনে এলাকার ভোটব্যাংকে প্রভাব বাড়ানোর চেষ্টা চলেছে। বন্ধ কারখানাকে টোপ হিসেবে সামনে রেখে চেষ্টা চলেছে শ্রমিক সংগঠনে রাজনৈতিক দলগুলির ক্ষমতা বাড়ানোর চেষ্টা। শুধু তাই নয়, কত কারখানা প্রকৃতই বন্ধ হলো, কেন হলো, কী ভাবে সেগুলি ফের খুলে উৎপাদন শুরু করা যাবে এ নিয়ে যতবার বিভিন্ন স্তরে সমীক্ষা হয়েছে ততবারই ভিন্ন ভিন্ন তথ্য পাওয়া গেছে। কেন? কারণ অভিযোগ, সেখানেও রাজনীতির লম্বা হাতে প্রকৃত পরিসংখ্যানকে কম-বেশি করে দেখানোর চেষ্টা চলেছে। বন্ধ কারখানা নিয়ে দীর্ঘ সময় আন্দোলন করেছে নাগরিক মঞ্চ। নাগরিক মঞ্চ-র নব দত্ত এবং শুভেন্দু দাশগুপ্ত যৌথ ভাবে এ নিয়ে একটি নিবন্ধে লিখেছেন :

পশ্চিমবাংলায় বন্ধ কারখানার সংখ্যা কত? এর নানা হিসেব সুত্রে পাওয়া। আমরা নানা হিসেবেই রাখছি।

একটা হিসেব, পশ্চিমবাংলায় ৫৫ হাজার কারখানা বন্ধ কিংবা রুগ্‌ণ। এটা কমিয়ে ভাবা। কারণ এ রাজ্যে ১ লক্ষ ৭৮ হাজার কারখানা সরকারি নথিভুক্ত নয়। আর এসব কারখানার ক-টা বন্ধ তার হিসেব সরকারিভাবে পাওয়া যাবে না। তেমনি ছোটো ও মাঝারি কারখানা নিয়ে সরকারি তথ্য নেই। সেখানে কত কারখানা বন্ধ জানা যায় না।

আর একটা হিসেব। সরকারি নথিভুক্ত কারখানার সংখ্যা ২০০৫ সংল নাগাদ ৬৯ হাজারের মতো। এই নথিভুক্ত কারখানার সংখ্যা মোট কারখানার ২৮ শতাংশ। আর এই নথিভুক্ত কারখানার প্রায় ৪২ শতাংশই বন্ধ।

সরকার নিজে একটা সমীক্ষা করে সরকারের শিল্প ও পুনর্গঠন দপ্তরের জন্য সরকারি সংস্থা ওয়েবকনকে দিয়ে। সমীক্ষা করা হয়েছিল ৫০০ বন্ধ ও রুগ্‌ণ কারখানা নিয়ে। রুগ্‌ণ ৪০২, বন্ধ ৯৮। বড়ো ও মাঝারি কারখানা ৩২৭, ছোট ১৭০।

অন্য সরকারি সূত্র, থার্ড সেন্সাস অফ এসএসআই সেক্টর ২০০০-২০১০। বন্ধ ২৬০৮০। রুগ্‌ণ ৫০৫৯৭। হিসেবটি নথিভুক্ত ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থায়।... বড়ো ও মাঝারি বন্ধ কারখানা ৩৪৩। বি আই এফ আর এ নথিভুক্ত। ৩৩৪টি রুগ্‌ণ শিল্প সংস্থা। এসব হিসেব বিভিন্ন সময়ে এখন এই অসময়ে বন্ধ কারখানা ঠিক কত বলা যাবে না।

রাজ্যের বন্ধ কারখানা পুনরুজ্জীবিত করা নিয়ে কদিন আগে আসোচেম একটি সমীক্ষা করেছে (এপ্রিল ২০১২)। তাতে তারা স্পষ্টই বলেছে, ৯০ শতাংশ কারখানাকে আর চালানো সম্ভব নয়। বাকি যে দশ শতাংশ রয়েছে তাদের ফের উৎপাদন চালু করা সম্ভব। এ জন্য বিশ হাজার কোটি টাকার সংস্থান করতে হবে সরকারকে। রাজ্যের ভাঁড়ারে টানাটানি, তাই তারা দরবার করেছে কেন্দ্রের কাছে। এর পাশাপাশি একটা উল্লেখযোগ্য তথ্য পাওয়া গেছে গত ২০১২-১৩-র আর্থিক সমীক্ষায়।

'রুগ্ন' হয়ে পড়া ৪৩টি বেসরকারি সংস্থা এবং ৬টি কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থাকে বিআইএফআর-এ পাঠানো হয়েছিল গত ৩১ ডিসেম্বর ২০১২ পর্যন্ত। এই সমস্ত সংস্থার সঙ্গে জড়িত ৭৮ হাজার ১২৫ জন কর্মী। সংস্থাগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করা গেছে। রাজ্য সরকার ঠিক করেছে তাদের অধিগৃহীত কোনো সংস্থাকেই বিআইএফআর-এ পাঠানো হবে না। পুনরুজ্জীবনের জন্য যা কাজ সেটা তারা নিজেরাই করবে। এর মধ্যে এটাও জেনে রাখা ভালো যে, সর্বশেষ আর্থিক সমীক্ষা অনুযায়ী এ রাজ্য থেকে ৩৭২টি 'রুগ্ন' ইউনিটকে বিআইএফআর-এ পাঠানো হয়েছে, যার মধ্যে ২৫টি কেন্দ্রীয় সরকারের অধিগৃহীত সংস্থা, আর বাকি ৩৪৭টি ইউনিট বেসরকারি শিল্প ইউনিটকে গুটিয়ে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আরও ৪৪টি বেসরকারি শিল্প ইউনিটকে বাতিল ও রক্ষণা-বেক্ষণের অযোগ্য বলে ঘোষণা করা হয়েছে। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এই সব গুটিয়ে ফেলার মতো বা বাতিল, রক্ষণাবেক্ষণের অযোগ্য সংস্থাগুলোতে এখন আর কোনো কর্মী নেই। বহুদিন আগেই তারা কারখানা ছেড়ে চলে গেছে। অতএব সর্বশেষ প্রদত্ত হিসেবে নথিভুক্ত কারখানা বা শিল্প ইউনিটের মধ্যে কমে গেল এ বছরই মোট ১৩৪টি। হিসেবটা দিলাম আরও একটি কারণে। ২০১১ ও ২০১২-তে রাজ্যে বাস্তবায়িত শিল্প প্রকল্পের সংখ্যা যথাক্রমে মাত্র ২৮ ও ১২, মোট ৪০টি। শিল্পে রাজ্য ক্রমশ কতটা তলিয়ে যাচ্ছে এই হিসেব থেকে কিছুটা বোঝা যাবে। □

দুর্বার ভাবনা

পাওয়া যাচ্ছে

হাওড়া স্টেশন (কলকাতা বাসস্ট্যান্ড, হাওড়া বাসস্ট্যান্ড) শিয়ালদহ স্টেশন (শানসাইন বুকস্টল, রামকৃষ্ণ পুস্তকালয়)
কলকাতায় : কলেজ স্ট্রিট (পাতিরাম, বুকমার্ক, মণীষা গ্রন্থালয়, বইচিত্র ও অন্যত্র) রাসবিহারী মোড়, শ্যামবাজার (পাঁচমাথার মোড়)
ঢাকুরিয়া (দক্ষিণাপণের বিপরীতে বইকল্প [দোতলায়]) বিধাননগর (উল্টোডাঙা) এবং
শিয়ালদহ-কল্যাণী শাখা ও শিয়ালদহ-বারাসাত শাখার বিভিন্ন রেল স্টেশনের বুকস্টলে ও অন্যত্র।
কলকাতার বাইরে
□ পশ্চিম মেদিনীপুরে ভূর্জপত্র (বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটি রোড) □ শান্তিনিকেতনে সুবর্ণরেখা
□ কুচবিহারে পার্থ লাহিড়ী, এইচ এন রোড □ নবদ্বীপের পোড়ামাতলায় সুজয়া প্রকাশনী □ রায়গঞ্জে ধানসিঁড়ি
যারা পত্রিকার এজেন্সি নিতে চান সরাসরি আমাদের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।
অথবা ফোন করুন ০৮৪২০ ০৬৬৫৯৪ অথবা ০৩৩ ২৫৪৩ ৭৫৬০

তথ্য, আখ্যান, প্রবন্ধের কোলাজ : *অপারেশান রাজারহাট*

লেখক রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তরুণ বসু-র দীর্ঘ কথোপকথনে উন্মোচিত বহু অকথিত কাহিনি এবং লেখার পদ্ধতি প্রকরণও

তরুণ বসু: প্রথানুগ উপন্যাসের বাইরে যে আলাদা করে ভাবা, লেখার ফর্ম আর কনটেন্ট থেকে শুরু করে— *কমুনিস* থেকে যদি ধরি, সত্তর দশকের আন্দোলনের সময়ের মধ্যে থেকে, তারপর এই বিশ্বায়িত সময়, পাল্‌টে যাওয়া সময়, তাকে কেন্দ্র করে ভাবনা, সমসাময়িক বিষয়বস্তুকে সমান ভাবে গুরুত্ব দিয়ে ধরা বা দেখা— এই দেখার ধারণাটা, এই যাত্রাপথটা যদি একটু ব্যাখ্যা করো।

রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায় : আমাদের এখানে যে জনপ্রিয় সাহিত্য, তার মধ্যে রোমান্সের ব্যাপারটা বেশি থাকে। কিছু রোমান্টিক ব্যাপার-স্যাপার, কাহিনি সর্বত্রই থাকে, কিন্তু সেই কাহিনি তারা এমন ভাবে উপস্থাপনা করেন যাতে পড়তে খুব ভালো লাগে এবং যখন পাঠক পড়ছেন তখন পাঠকের মধ্যে বেশ একটা কমফোর্ট কাজ করে। কোনো বিরক্তি জাগে না এবং বিপন্নও বোধ করে না। অর্থাৎ পাঠকের সঙ্গে লেখকের যেন গোদা-বিনোদনের আগাম একটা চুক্তি থাকে, অনাক্রমণ চুক্তি। সেই চুক্তিটার শর্তগুলো মেনেই লেখা হচ্ছে, ফলে সেই লেখা খুব স্নিগ্ধ এবং ঘটনার পর ঘটনার চলমান সচিত্র সংবাদভাষ্যেরই রকমফের হয়ে ওঠে। মনে হয়, মূলত এইরকম একটা ভাবনা কাজ করে— কিন্তু এর বাইরে ছিটকে-ছাটকে অন্যরকম লেখা যে একেবারেই হয় না তা নয়, হয়। তবে হ্যাঁ, যদি আমার লেখার কথা বলো, তাহলে বলতে হয়, বাল্য কৈশোর কাটার পরে একজন রাজনৈতিক কর্মী হিসেবেই আমার সচেতন জীবন শুরু। এবার সেই রাজনীতির সূত্রেই আমি *কমুনিস* লিখি। *বাদার গল্প, অকালবোধন ও অন্যান্য গল্প*-ও সেই একই সূত্রে লেখা। এই লেখাগুলোর থেকে যে একটা (এখানে 'দায়বদ্ধতা' শব্দটা আমি ব্যবহার করতে চাই না কারণ শব্দটা অপব্যবহার এবং বহু-ব্যবহারে জীর্ণ হয়ে গেছে।) Sense of belonging, একটা কোথাও লগ্ন থাকা--- আমার ব্যক্তিগত ইতিহাসও তাই, রাজনৈতিক সূত্রও তাই। যারা সুবিধেপ্রাপ্ত নয়, স্বাধীনতার সুফল যারা পায়নি, এই যে বিশেষ জনগোষ্ঠী তার সঙ্গে কোনো না কোনো ভাবে একটা সম্পর্ক আমার হয়ে যায়। মূর্ত এবং বিমূর্ত—দুই অর্থেই। আমি থেকেছি ছোটো- বেলায় যে-সব অঞ্চলে, সবই স্লাম (slum) ঘেরা এলাকা, সংগঠিত ও অসংগঠিত শিল্পাঞ্চল— এরকম সব। তারপরে রাজনীতির সূত্রে গ্রামে যাওয়া। পরে পেশাগত কারণেও পশ্চিম বাংলার প্রায় প্রতিটি জেলায় ঘুরেছি। এর থেকেই, যে মানুষরা, যাদের অন্তত স্পর্শ করেছি, তাদের জীবনযাত্রা, প্রতিটি দিন আমাদের থেকে কত দূরের, যেন অন্য এক গ্রহের বাসিন্দা— সেই মানুষদের কথাটা আসে। *কমুনিস* যখন শুরু করি তখন— যে মানুষগুলো আছে আর যে ব্যবস্থাটা— অর্থাৎ অসাম্যের বুনিয়াদে গড়া একটা সমাজ ব্যবস্থা। Basic rights থেকে deprived মানুষ তো শুধু জঙ্গলমহলেই নয়, দেশের সর্বত্রই কম-বেশি রয়েছে। যে সমস্ত সামাজিক রীতিনীতি, যে আইনি ব্যবস্থা এবং যে রাষ্ট্রিক কাঠামো এই ব্যবস্থাটাকে জোরদার করে, নকশালবাড়ি আন্দোলন সেটাকেই প্রশ্ন করেছিল। তার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছিল। এর যে অগ্রণী বাহিনী (তখন এই 'আভা গার্দ' সংস্কার ছিল, ওই সেন্ট্রাল কমিটি সিনড্রোম) বা তাতে শহরের যে-যুব-ছাত্র-বেকার-মজুররা অংশগ্রহণ করেছিল এবং সেই আন্দোলনে যারা নেতৃত্ব দিচ্ছিল, আমি তাদের আরবান গেরিলা বলি--- তাদেরই কথা *কমুনিস*। বাংলায় নকশালবাড়ি আন্দোলন নিয়ে অনেক লেখা হয়েছে, কিন্তু আরবান গেরিলা নিয়ে *কমুনিস* ছাড়া একটাও লেখা নেই। সেই আরবান গেরিলাদের কথা এখানে যেমন আছে, তার সঙ্গে এসেছে বস্তির সাধারণ মানুষের অনেক কথা। এবার এদের কথা যখন পাঠকের গোচরে একটা বিশেষ ভাবে আনতে চাইছি তখন আমি 'সাহিত্য' নামক কোনো বর্গ-র কথা ভাবিনি। 'সাহিত্য' শব্দটাই ভাবিনি। আমি শুধু ভেবেছি, যে, এদের চিন্তা বা এদের যা অভিজ্ঞতা, মানে এই বিপ্লবাকাঙ্ক্ষী যুবক যারা, তাদের ভাষা আর বস্তির সাধারণ মানুষের যে ভাষা— এই ভাষার সাহায্যেই আমাকে একটা দলিল নির্মাণ করতে হবে, যেটা অনেকদিন কথা বলবে। আমি সেই দলিলটা তৈরি করতে চেয়েছি। এই দলিল মনের কথাও বলবে, অনুভূতির কথা বলবে। এ শুধু কতকগুলো শুকনো ফ্যাক্ট বলবে না। যদিও সে-সব কিছু থাকতে পারে, আছেও হয়তো, ঠিক মনে নেই। তো এইটা করতে গিয়ে— *কমুনিস*-এ একটা ভাষাই তৈরি হয়ে যায়। যে-ভাষাটার সঙ্গে আমাদের বাংলা সাহিত্যের ভাষার তফাত তো আছেই এবং এ একটা নতুন ভাষা হয়ে যায়।

তরুণ : তাহলে তো এই প্রশ্ন উঠতেই পারে যে, এই নতুন ভাষাটা কি সাহিত্যে কিছু অবদান রাখতে পারল ভাষাগত ভাবে—যা পরবর্তী কালে আবার কেউ লিখল (পরম্পরা), যেটা থেকে ভাষাটা enrich করল।

রাঘব : না, ঠিক তা না। সেরকম ভাবে আমি চেষ্টা করিনি আর সেরকম হয় কি না আমি জানিও না। কারণ এ অভিজ্ঞতাটাও খুব একটা unique অভিজ্ঞতা, তার প্রকাশটাও unique, তার ভাষাও আলাদা। ভাষার প্রশ্নে একটা জিনিস বলব যে, যখন দেখা যাবে---

এখানকার যে রাজনৈতিক কর্মীরা (নকশালপন্থীরা)— তারা যে ভাষায় কথা বলছে— সেই ভাষার মধ্যে অনেক রাজনৈতিক পরিভাষা রয়েছে— আবার এই রাজনৈতিক পরিভাষার কথা শুনছে যখন সাধারণ বস্তিবাসী, কারখানার শ্রমিক, তারা আবার তাদের উচ্চারণে, তাদের বোধে, সেই পরিভাষাগুলো পাল্টে ফেলছে। পাল্টে ফেলে একটা অন্য রকমের শব্দের জন্ম দিচ্ছে। কমিউনিস্ট শব্দটা হয়ে যাচ্ছে কমুনিস। এটার একটা পূর্বসুরী আছে — সমরেশ বসুর একটা গল্প ছিল, 'কিমলিশ'— সেখানেও কিন্তু এই জিনিসটা ছিল, যে সে কমিউনিস্ট উচ্চারণ করতে পারত না। আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, যখন *কমুনিস* লিখছি তখন সমরেশ বসুর গল্পটা আমি পড়িনি। পরে পড়েছি। এখন এটা অদ্ভুত ব্যাপার, ভাষারই বলব আমি—যে হয় কি, সেটা পড়া থাকতে হবে এমন নয়—কিন্তু এইটা যেহেতু লেখা হয়ে গেছে, এইটা যেহেতু পড়াও হয়ে গেছে— এবং অনেকে পড়েওছে, জিনিসটা তখন আমাদের সাংস্কৃতিক আবহাওয়ার মধ্যে চলে আসে। তা ছাড়া, ওটা বইতে না পড়লেও বা গল্পটা না পড়লেও আমি তো হিউজেস রোডের আলিকে এই শব্দটাই (কমুনিস) উচ্চারণ করতে শুনেছি। এই সূত্রে অন্য একটা কথা, ভাষার সর্বজনীনতার দিক, যেমন, — রবীন্দ্রনাথ আমাদের আবহাওয়ার মধ্যে থাকেন। কেমন ভাবে চলে আসে রাবীন্দ্রিক প্রভাব। বাংলায় যে লিখবে সে কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এড়াতেই পারবে না। কোনো না কোনো ভাবে রবীন্দ্রনাথ থাকবেই। যে ভাষাটার কথা আমি বলছি, যে ভাষায় আমি লিখেছি, সেই ভাষাটাও কিন্তু ছিলই । আর আমি একবারও বলছি না যে, এই ভাষাটা আমার ভাষা। বরং আমি বলতে পারি যে, এই ভাষাটা আমি নির্বাচন করেছি। ভাষাটা ছিলই। এই ভাষার মধ্যে বইয়ের ভাষা যে মোটেই নেই তা নয়, বইয়ের ভাষাও আছে। কারণ ভাষা এমন একটা জিনিস, যা কোনো ব্যক্তির নয়, সমষ্টির। ব্যক্তি যখন সেই ভাষাটায় কথা বলে বা কিছু করে তখন সেই ভাষায় নতুন কোনো অভিঘাত সৃষ্টি করে শব্দগুলো সাজায়, নিজের মতো করে বা শব্দগুলোকে পর পর বসিয়ে একটা নতুন মানে তৈরি করার চেষ্টা করে। কাজেই ভাষার যে প্রবাহটা তার থেকে নতুন অভিঘাত ও অর্থসম্পন্ন এই ভাষাদেশ প্রান্তের হলেও, আবার ঠিক পুরোপুরি সেই উৎসেরও থাকল না। এই ভাবে একটা অন্য ভাষা *কমুনিসে* তৈরি করা হয়েছিল। বা তৈরি হয়ে গিয়েছিল যা ছাপায় ছিল না। ভাষা -নিশান ধরে শহুরে প্রান্তজনেরা যেন বাংলা সাহিত্যে নিজের শিবির গড়ে নিল।

তরুণ : ওই সময়ে নকশালবাড়ি আন্দোলন নিয়ে বেশ কয়েকটা উপন্যাস লেখা হয়। স্বর্ণ মিত্র-র *গ্রামে চলো*, গুণময় মান্না-র *শালবনী*, জয়ন্ত জোয়ারদারের *এভাবেই এগোয়*, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়-এর *শ্যাওলা*, সমরেশ বসু-র *মহাকালের রথের ঘোড়া*, মহাশ্বেতা দেবীর *হাজার চুরাশির মা* অসীম রায়ের *অসংলগ্ন কাব্য* ইত্যাদি। *হাজার চুরাশির মা* একটু অন্য ধরণের লেখা, যেখানে একটা মধ্যবিত্ত শ্রেণির কথা, সেই আবহাওয়ায় বড়ো হওয়া একটি ছেলের নকশালবাড়ি আন্দোলনে জড়িয়ে পড়া এবং তার মৃত্যুর কথা। *মহাকালের রথের ঘোড়া* বলা হয় জঙ্গল সাঁওতালের জীবন অবলম্বনে লেখা। শীর্ষেন্দু-র *শ্যাওলা* একটা আন্দোলনকে যতটা কুৎসিত নেতিবাচক করে দেখানো যায় তাই। গুণময় মান্না-র উপন্যাসটা প্রায় একটা নিটোল প্রেমের কাহিনি। আমি বলতে চাইছি, দেখার এই যে ধরণ, মধ্যবিত্ত নাগরিকের চোখ দিয়ে মধ্যবিত্তের কাহিনি, তাদের সঙ্গে *কমুনিসে*-র একটা তফাত আছে। তাদের দেখার ভেতরে, তাদের ভাষার, তাদের যে আশা আকাঙ্ক্ষা, তারা যা ভাবে তার থেকে একটা প্রস্থান। আমরা যখন পড়তে শিখছি, সেই সময়ে *কমুনিস*-কে আমরা এই অন্যরকম ভাবেই জেনেছি। তাছাড়া তখনকার অনেক বোদ্ধার মুখেই তখন শুনেছি যে, *কমুনিস* আলাদা করে ভাবানোর মতো লেখা, অন্য অনেক লেখাই যা পারেনি। তাদের ক্ষেত্রে কাহিনিটা হয়তো মনে থেকে গেছে বা গড় গড় করে পড়ে যাওয়ারও একটা ব্যাপার ছিল— কিন্তু *কমুনিস* পড়তে গিয়ে সবাইকেই খানিকটা ভাবতে হয়েছে। সে তো শুধু ভাষার কারণে নয়। তার তো তাহলে অন্য আবেদনও থাকার কথা এবং ছিলও। এই যে জায়গাটা— এই যে পার্থক্যটা তৈরি হয়ে গিয়েছিল তখনই— কী ভাবে?

রাঘব : এখানে আমার একটা সুবিধে ছিল— অনেক সময় অজ্ঞানতা একটা আশীর্বাদ হয়—যখন আমি *কমুনিস* লিখছি তখনও পর্যন্ত আমি সচেতন ভাবে সাহিত্য করছি বলে তো লিখছিই না। আমি লিখছি একটা তাগিদ থেকে। একটা রাজনীতি, একটা আন্দোলন, একটা ঘটনা, বিশাল একটা সামাজিক ঘটনা, সেই ঘটনাটার সম্পর্কে যে স্বপ্ন, সেই স্বপ্নটা চোখের সামনে ভেঙে যাচ্ছে। সে সময় আমি জেলে। জেল থেকে বেরিয়ে আসার পর *কমুনিস* লিখি— জেলে থাকতেই লিখতে শুরু করি, জেল থেকে বেরিয়ে আসার পর শেষ হয় লেখাটা। জেলে বসে এটা যখন লিখছি, তখন একটা স্বপ্ন দেখছিলাম আমি, অনেকের সঙ্গে ভাগ করে। সেই স্বপ্নটা ভাঙছে, এবার জেলে চলে আসছি, বাইরের দুনিয়ার থেকে বিচ্ছিন্ন... সমাজজীবন তো আমার নেই, প্রতক্ষ্যত, জেল জীবন হয়ে গেল। তখন আমি অনুভব করতে পারছি (অনেকে তখনও পর্যন্ত এটা বুঝতে পারেননি), এই আন্দোলনটার যা দেবার বা যা করার সেটা হয়ে গেছে। এক্ষুণি আর এর থেকে কিছু হবে না। মানে, বলা যেতে পারে যে, আমাদের বিপ্লব, 'সত্তরের দশককে মুক্তির দশকে পরিণত করো'—এই যে শ্লোগান, সেই শ্লোগানটার আর কোনো যৌক্তিকতা থাকছে না। বিপ্লব ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে এরকম নয়, সত্তরের দশকে যে হচ্ছে না সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই—এটা তখন বুঝেছিলাম। এই বোঝাটার পর মনে হয়েছে যে, তাহলে এই যে গল্পগুলো তৈরি হলো, এত লোকের স্বপ্ন, এত লোকের আশা-নিরাশা, এত কিছু মন্থন করে যে গল্পটা দানা বাঁধছিল, সে-গল্পটা তো হারিয়ে গেল—সেই গল্পটা আমাকে লিখতে হবে। সেই গল্পটা থাকা দরকার। এইটা আমি খুব feel করেছিলাম যে গল্পটা থাকা দরকার। কোনো রকম ভাবে হয়তো আমার একটা, বলা যেতে পারে যে, একটা এলিজি রচনার প্রবণতাও হয়তো কাজ করছিল। একটা শোক, একটা স্মরণের ব্যাপার কাজ করছিল। শোক হলে তো স্মরণ আসে। স্মরণের ব্যাপার চলে আসছিল। সেই স্মরণটা আমি এই ভাবে করবার চেষ্টা করেছি। এইবার যদি আমি বলি যে, তার আগে পর্যন্ত আমার যে পড়াশুনো, সেই পড়াশুনোয় আলাদা করে সাহিত্য নিয়ে যে বিশেষ চর্চা ছিল

তা নয়। সাহিত্যের বই নিশ্চয়ই পড়েছি কিন্তু আলাদা করে যে একটা সাহিত্য নিয়ে পড়া তাতো নয়, তখনও পর্যন্ত আমি সে ভাবে পড়িইনি। তখন যে সাহিত্য পড়তাম— প্রোগ্রেসিভ লিটারেটার— এই-ই। সাহিত্যের নিবিষ্ট ছাত্র আমি তখনও পর্যন্ত ছিলাম না। ফলে সেই সময়ে বাংলা ভাষায় যাঁরা লিখছেন-টিখছেন, যাঁরা প্রতিষ্ঠিত লেখক, প্রতিথযশা লেখক, তাঁদের অনেকেরই লেখা আমার পড়া হয়নি। যেহেতু আমি তাঁদের লেখা পড়িনি বা পড়া হয়নি, তাই বাংলায় যেভাবে লেখা হয়—তার যে ধরতাইটা সেটাই আমার কাছে নেই। এই যে স্কুলের difference-টা, এই difference-টা একটা situation-গত, অর্থাৎ, এখন আমি ডিফারেন্সটা সম্পূর্ণ সচেতন বলে দাবি করলে তা ঠিক হবে না। এই ডিফারেন্সটা ভাষা রাজনীতির যুগলবন্দি বলেই ধরতে হবে। আবার, আমি তো সাহিত্যই ভাবিনি— ফলে এটা আমার দেখবার দরকার নেই যে, বাংলায় কী ভাবে সাহিত্য রচনা হয়। বা সাহিত্যের খোপের মধ্যে এই অভিজ্ঞতাকে স্থান করে দেওয়ার কথাও আমি ভাবিনি। এবং আমি এখনও জানি না *কমুনিস*-কে সাহিত্য বলা যায় কিনা। অবশ্য রচনামাত্রই সাহিত্য এমন একটা বিচার এখন মান্যতা পাওয়ায়, হয়তো এটা আর কোনো প্রশ্নই নয়। সাহিত্য বলতে এই যে আলাদা একটা বর্গ নির্ধারণ করা এবং তারপর তাকে একটা আভিজাত্য দেওয়া, যেটা প্রবন্ধ পাবে না, প্রবন্ধের বেলায় কেন আমি বলব প্রবন্ধ সাহিত্য? কিংবা ধরা যাক, একটা স্মৃতিকথা। সেই স্মৃতিকথাকে আমি স্মৃতিকথাই বলব— কবিতা-গল্প-উপন্যাসের যে বর্গ তার বাইরেই রাখা হবে। ভাষায় যখনই লেখা হচ্ছে, যে কোনো ভাষায় লেখা হচ্ছে, তাই সাহিত্য। সেটা আজকে আমরা বুঝতে পারি। তখন সেটা বলা হতো না। *কমুনিস*-কে আমি সাহিত্য বলে ভাবিইনি, বলা যেতে পারে খুবই প্রাণিত লেখা। আমাকে লিখতেই হতো। এই অভিজ্ঞতাটাকে কোথাও একটা লিপিবদ্ধ করতেই হতো। কিন্তু তার ভাষা আমার কাছে ছিল না। মনে হয়েছিল যে ভাষায় আমরা কথা বলছি, আন্দোলনের মধ্যে এবং আন্দোলনের বাইরে, কারখানায়— বস্তিতে কথা হচ্ছে, তখন যে ভাষায় কথা হচ্ছে, সেই ভাষা থেকে *কমুনিসে*-র ভাবকে উচ্ছেদ করা কাম্য তো নয়ই, অসম্ভবও। মার্জিনাল পিপল যাদের বলি এখন— সেই প্রান্তিক মানুষের ভাষাটাই ওখানকার প্রধান ভাষা। এবং সেই ভাষাতেই জিনিসটা এগিয়েছে। সময়ের যে দ্রুতি, সময়ের একটা দ্রুতি আছে তো, তুমি দেখবে খেয়াল করে যে, লেখাটার মধ্যে included, যতিচিহ্নের ব্যবহার বলতে প্রধানত আছে পূর্ণচ্ছেদ। অন্য যতিচিহ্নের ব্যবহার খুব কম। যতির এ-রকম ব্যবহার উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। পূর্ণচ্ছেদ একটা গতি দেয়। তুমি যখন একটা বাক্যের মধ্যে, একটা কমা, একটা সেমিকোলোন এগুলো ব্যবহার করো, সেটা কিন্তু বাক্যটাকে থামায়, থমকায়, একটু জটিলও করে। যখন তুমি কিছু শব্দ দিয়ে একটা কথা এক নিঃশ্বাসে বলছ, এক নিঃশ্বাসে বলে থামলে, তারপর পরের কথাটায় গেলে, এবং সে সময়টার কথা আমরা বলছি, সেই সময়টায় .... যেমন একটা শব্দ বলছি, অ্যাকশান, এই শব্দটা বহুবার আছে— এখানে বাক্যগুলোও অ্যাকশান। একটা বাক্যও নেই যেটা আলসে। একটা বাক্যও নেই যেটা বসে খায়। এরা খুবই খাটিয়ে। প্রত্যেকটা বাক্যই খুব active এবং তারা সবসময় situation-টাকে এক-একটা বাক্যে আরেকটা জায়গায় পৌঁছে দিচ্ছে— গতিশীলতা যেমন, তেমনই তাড়া, তেমনই ঝড়, ঝড়ো সময়। যেমন ধ্বনির ব্যবহার খুব আছে ওখানে। তার কারণ হচ্ছে শ্লোগান। ওই সময়ে যে শ্লোগানগুলো ছিল, সেই শ্লোগান গায়ে কাঁটা দিত এবং উজ্জীবিত করত। উপন্যাসটার মধ্যে দেখবে যে প্রভূত ধ্বনির ব্যবহার আছে। এখন এইরকম অনেক জিনিস আছে। উপন্যাসের কথাটা বলতে আমার কোনো অসুবিধে নেই। এটা একটু পরিষ্কার করা দরকার, অনেকের যেটা হয় যে উপন্যাস কাকে বলব, কাকে বলব না, এই নিয়ে একটা... নভেল বলতে যা বোঝায়, ইওরোপীয়ান নভেল, তার যে defination, তাই দিয়ে উপন্যাস বিচার করা শুরু করে। বাংলায় উপন্যাস বলতে শুধু যে এই ইউরোপীয় নভেলই বুঝতে হবে তা কিন্তু নয়। যদি আমরা ব্যুৎপত্তিগত বা অন্যান্য দিকে যাই তাহলে দেখব উপন্যাস হচ্ছে বিন্যাস। উপন্যাস, বিন্যাস, প্রস্তাব, প্রবন্ধ, প্রহসন, বৃত্তান্ত, কাহিনি

তখন-ও স্বাধীনতার জের কাটেনি। রায়টের তাণ্ডব কমেনি। হিন্দু মুসলমান রায়ট। রায়টের আগে মিলিটারি। রায়টের পরে মিলিটারি। আর বুকফাটা তীক্ষ্ণ আর্তনাদ গম্ভীর আকাশ ছ্যাঁদা করেছিল, আমি ... রসুল। আজ—শুয়োরের বাচ্চা! তখন কৎ করে একটা শব্দ। ঢিলে নরম শরীরে বিদ্ধ হয় অস্ত্রের ফলা। আর আক্রান্ত মানুষটা হেঁচকি তোলে; আমি ... রসুল। তার একটা ঠ্যাং ক্যাওড়াপট্টিতে ঘস্‌টাতে থাকে। টালিগঞ্জ ঘড়িঘর থেকে ভেসে আসে 'আল্লাহ আকবর!' আর হোগলার বেড়ার পেছন থেকে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি দশ-পনেরো বছর একলাফে পার করে আছড়ে পড়েছিল রসুলের বুকে। তখন বন্দেমাতরম্। ... তখন আল্লাহ আকবর।

'শৈশব', ১৯৭৬।

অনেক কিছু হতে পারে। এই যদি হয়, যদি বৃত্তান্ত হয়, যদি উপাখ্যান হয়, যদি বিন্যাস হয়, যদি প্রস্তাব হয় তাহলে, উপন্যাসে কিন্তু যে একটা—প্লট থাকতেই হবে তার কোনো মানে নেই। উপন্যাসের যে চরিত্রগুলো যাকে বলে চরিত্রায়ণ, সেটা করতে হবে তারও কোনো মানে নেই। এখন এই বাংলা-উপন্যাস কে লিখেছে? এই বাংলা উপন্যাস কিন্তু আমাদের লেখা হয়নি। বঙ্কিম থেকেই কিন্তু আমরা ইউরোপীয়ান নভেলই লিখছি। কমলকুমার মজুমদারের *খেলার প্রতিভা, অন্তর্জলী যাত্রা*-ও উদ্ভাবনী বাংলা উপন্যাস গোত্রের অন্তর্গত। এবং এই সব লেখা পাঠকের কমফোর্ট জোনকে নিরাপত্তা দেয় না, সেখানে বিস্ফোরণ ঘটায়। যদি সতীনাথ দেখি, যেহেতু সাগা ধরণের লেখা লিখেছেন, অনেক প্রক্ষেপণ আছে, অজস্র চরিত্র। সেই সব চরিত্র যে কাহিনির চলায় সর্বদা খুব একটা contribute করছে এমনও নয়— এমনিই আসছে-যাচ্ছে। একটা ছায়া, গন্ধ, আবহের মতো বা তার অন্তর্গত কিছু।

তরুণ : *ঢোঁড়াই চরিত মানস*।

রাঘব : হ্যাঁ *ঢোঁড়াই চরিতমানস*, এটার কথাই বলছিলাম আমি। কিংবা আখতারুজ্জামানের *খোয়াবনামা* যদি আমি দেখি— ওখানে কিন্তু উপন্যাস পাচ্ছি—বাংলা উপন্যাস আসলে আমরা অনেক পরে পেলাম। বাংলা উপন্যাস লিখতে হবে, বাংলায় উপন্যাস লেখা সম্ভব, এইটা বঙ্কিমে পাচ্ছি। বঙ্কিম চেষ্টা করেছেন, বাংলা ভাষায় যে উপন্যাস লেখা যায়, এটাই জানা ছিল না, বঙ্কিমকে সেই কাজটাই করতে হয়েছে। সেই কাজটা করবার সময় তিনি ইউরোপীয়ান নভেল স্ট্রাকচারটা (এক্ষেত্রে ইংরেজি নভেল) ধরে একরকম ভাবে করেছেন, হিস্টোরিক্যাল রোমান্স-টোমান্স এরকম নানারকম করে লিখেছেন। রবীন্দ্রনাথ এই পথে হাঁটেননি। ইনফ্যাক্ট *গোরা* তো প্রবন্ধ-প্রস্তাব-প্রতর্কের বিন্যাস।

তরুণ : হ্যাঁ! *গোরা*-ই তাই।

রাঘব : ফলে এইটা আমাদের এখানে পাশাপাশিই আছে। কিন্তু এইখানে...

তরুণ : এবং একই সময়ে লেখা *চতুরঙ্গ*ও। সমসাময়িক বিষয়-বিতর্ক সরাসরি লেখায় হাজির হচ্ছে।

রাঘব : *চতুরঙ্গে* প্রস্তাবটাই বড়ো। যেটা পরে আধুনিক উপন্যাস তত্ত্বে, যেমন ডিসকোর্স নভেল নামে একটা জঁর বা গোত্র আছে। বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে নভেলটা তৈরি হচ্ছে। এরকম নভেল অনেক আছে। দস্তয়েভস্কি-র নভেলের মধ্যে এই ধর্ম আছে। তারপর এখন লাতিন আমেরিকায় যে সমস্ত নভেল লেখা হচ্ছে— একটা অদ্ভুত ধরণের লেখা। একটা উপন্যাসে, তুমি কী ভাবে পড়বে সেটা তোমাকে বলে দিচ্ছে। সাজানো আছে একরকম করে— বলছে যে, এইটা আগে না পড়ে ওইটা আগে ও পরে এই অংশটা পড়ো। যে উপন্যাসটার কথা বলছি সেটা একটা ইন্টারেস্টিং নভেল—*হপ্‌সকচ* (*Hopscotch*), লেখক জুলিও কোরতাজার। লেখক জানান, অনেক বই নিয়ে গড়ে উঠেছে এই বই, তবে প্রধানত দুটি — প্রথম বইটি নর্মাল ফ্যাশনে পড়ে যান— দ্বিতীয়টির জন্যে এই নির্দেশ নামা— প্রথমে পড়ুন ৭৩নং পরিচ্ছেদ। আচ্ছা আমি যদি এটার পর ওটা পড়বো তাহলে তুমি ওভাবে লিখবে কেন? এইটা হচ্ছে game। আমি একটা উপন্যাসকে নানারকম ভাবে লিখতে পারি, নানারকম ভাবে পড়তে পারি। যখন আমি নিজে সাজিয়ে পড়ছি, তার মানেই গল্পটাকে কিন্তু আমি change করছি। পরম্পরা ভাঙ্‌ছি এবং গড়ছি। এটার পরে ওটা, ওটার পরে, কার্যকারণের যে নিয়মটা, কার্যকারণের নিয়মের মধ্যে ঢুকে পড়ে আমি একটা অন্য জিনিস জানাচ্ছি। নিয়মটাকে তছনছ-ও করে দিচ্ছি। লাতিন আমেরিকার উপন্যাসিকদের লেখায় এরকম বহু কিছু খুঁজে পাওয়া সম্ভব, সেরভেন্তেসে-ও আছে, ভার্গাস থেকে বোলানো এই উপন্যাস যাত্রা চলছে। আমার কাছে অনন্য অজ্ঞানতাই আশীর্বাদ। আমার কাছে তখন কোনো ইওরোপীয়ান নভেল স্ট্রাকচার নেই। আমার কাছে তখন যেটা হাজির হচ্ছে সেটা এই অভিজ্ঞতাটা। এই যা ঘটেছে। একেই আমার রূপ দেওয়ার কথা। আমি তারই চেষ্টা করেছি। আর আমার মনে হয়েছে—সেটা এই ভাবে রূপ দেওয়া যেতে পারে। তারপরে তো এই *কমুনিস* চারবার ছাপা হয়েছে। এখন পঞ্চমবারের ছাপার কাজ চলছে। কখনই আমি কিন্তু ছাপার ভুল সংশোধন ছাড়া কোনো কিছু পরিবর্তন ঘটাইনি। সেটা এই কারণে যে, ওই সময়ে আমার যে মনটা ছিল, ওই সময়ে আমার যে বোধটা ছিল, সেটাতে আমি কখনও ফেরত যেতে পারি না। আর এটা যেহেতু অনেকটা ওই সময়ের একটা.... ফসল বলো, উৎপাদন বলো—যা খুশি বলো—সেখানে আমি আর এটা করতে পারি না। করলে তা অনৈতিক হবে। যদিও এখন পড়তে গিয়ে আমার নিজেরই অনেক খুঁত চোখে পড়ে।

কমুনিস পর্বর পর, *বাদার গল্প* এবং *শৈশব*-এর পর্ব থেকে আমি লেখার কথা অনেক সচেতন ভাবে ভাবতে শুরু করি, নিজেকে প্রস্তুত করায় মন দিই। সাধ্যমতো পড়াশুনো করেছি। এতে সাহিত্য সংক্রান্ত একটা ধারণা আমার তৈরি হয়েছে। এবং এখন একটা লেখা লিখতে গেলে আমাকে ভাবতে হয়, আগে যে লেখা লিখেছি তার সঙ্গে কী সম্পর্ক— কী করতে চাইছি, না করতে চাইছি। সারা পৃথিবীতে কী ধরণের লেখা হচ্ছে এটা খোঁজ রাখতে হয়। ফলে কী হয়—মনটা অন্যরকম হয়ে গেছে। একটা untrained mind ছিল। এখন mind-টা কিন্তু trained হয়ে গেছে। একটা discipline-এর বাইরের গল্প। আর একটা হলো discipline-এর ভেতরের গল্প। এখন কিছু করলে— consciously-ই করি। consciously বলতে বলছি ভেবে করা। তখনও consciously-ই করেছি। কিন্তু রূপটা নিয়ে, এটা ছাড়া হবে না মনে হয়েছে বলে করেছি—তার বেশি কিছু না। কিন্তু তার সঙ্গে অন্য কিছুর তুলনা করা বা ভাবা, এটা করিনি। এটা করার মতো অবস্থাতেও ছিলাম না। আর প্রয়োজনও বোধ করিনি।

তরুণ : এই পূর্বপ্রসঙ্গটাই ধরতে চাইছিলাম। শুরুটা এইটা। এরপরে তোমার লেখায় অনেক change এসেছে। তারপর একটা তুলনামূলক ব্যাপার চলে এসেছে, অন্তত আমার নিজের কাছে এসেছে। সেটা হলো এই যে, এই সময়ের, মানে তোমাদের সমসাময়িক যারা গল্পকার, ঔপন্যাসিক, বা কাহিনি বা প্রস্তাব রচয়িতা যাই বলি না কেন, তাদের সঙ্গে নানা দিক থেকেই আলাদা করে তোমাকে দেখা যায়। আলাদা করে পাওয়া যায় *অপারেশান রাজারহাট*-এ পৌঁছে। আমি নিজেও পাঠক হিসেবে যদি দেখি তাহলে বলতে পারি, এই ঘরানার লেখাটা তোমার একটা বিশেষ

নিজস্বতা। তারপর বিষয়-বৈচিত্র্য। অনেক সমসাময়িক বিষয় এসেছে— বাংলা সাহিত্যে সমসাময়িক কালের ঘটনা নিয়ে তথ্য-সমৃদ্ধ লেখা খুবই কম এসেছে....। যদিও আগেই রবীন্দ্রনাথের কথা এসেছে। বিশ্ব সাহিত্যেও হয়তো অনেক উদাহরণ পাওয়া যায় বিশেষত তলস্তয় বা দস্তয়েভস্কি মতো sensitive লেখকের কথা আমরা জানি। আবার আমাদের এই সময়ের, নগর দিয়ে গ্রাম ঘেরার মতো বৃহৎ বিষয় এক তথ্য-সমৃদ্ধ আখ্যান হয়ে উঠেছে *অপারেশান রাজারহাট*-এ। একে কি আমরা তাহলে ডকু-নভেল বলতে পারি?

রাঘব : *অপারেশান রাজারহাট*-এ ডকু-উপন্যাসের কিছু ধর্ম আছে। কিন্তু আমি একে ডকু-উপন্যাস বলছি না। ওই ভাবে চিহ্নিত করা যাবেও না। যদিও ডকু-উপন্যাসের কিছু মেজাজ এখানে আছে। কিছু ধর্ম এখানে আছে। তুমি, যে কোনো sensitive লেখকদের ক্ষেত্রে এটা ঘটে বলে তলস্তয়ের কথা বলছিলে, রবীন্দ্রনাথের কথা বলছিলে। এসেছে *চতুরঙ্গ*, *গোরা*-র কথা। আমি তলস্তয়ের কথাটাই বলছি। যদি *রেজারেকশান* ধরি—বা যদি *ওয়ার অ্যান্ড পিস* ধরি। তাতে আমরা দেখব যে, সেখানে একটা জিনিস হচ্ছে যে, যেটাকে আমি তথ্য বলে বলছি, সেটা শুধু তথ্য নয়। ইতিহাসের সঙ্গে একটা সংলাপ। সেখানে একটা ইতিহাস চলে আসে, যে, serfdom-এর যে হিস্ট্রিটা, সেটা *রেজারেকশানে* আছে— সেটার সঙ্গে একটা ডায়লগ চলছে। এখানে তোমায় নেপোলিয়নের সময়কার যে যুদ্ধের বৃত্তান্ত, রাশিয়ার যে অ্যারিস্টোক্রেসি, তার একটা গল্প, এবং এই সবটা মিলে যে যুদ্ধকে একটা দেখার ব্যাপার, আরও অনেক সমস্ত ব্যাপার-স্যাপার আছে। কিন্তু একটা ইতিহাসের উপস্থিতি আছে। আমার ভীষণ ভাবে মনে হয় যে, ডকু বা ডকুমেন্টেশান শব্দটার সমস্যা হচ্ছে যে, সে ইতিহাসকে খর্বিত করে ফেলে। অতীত ফসিল ফ্রিজ হয়ে যাচ্ছে। সাহিত্য ইতিহাসকে নিজের কোলে টেনে নেয়, তার ধর্মই খানিকটা বদলে দেওয়া। কিন্তু আমার মনে হয় না আমার লেখাতে আমি এই ভাবে জিনিসটা ব্যবহার করেছি। যে কারণে *অপারেশান রাজারহাট*-এ মাটিরও গল্প আছে। সে তো ডুকমেন্ট নয়। আছে স্বাধীনতার আন্দোলনের সময়কার একটা জাহাজের কথা। একটা স্টিমারের কথা। এরকম আরও অনেক গল্প আছে। এমন সব তথ্য বড়ো ইতিহাসে অচ্ছুত, যা আঞ্চলিক, প্রান্তিক তাই বা ইতিহাস নয় কেন— ইতিহাস এখানে সালের নোকর, পর্বদাস নয়— সে জীবন স্পন্দন— ইতিহাস পালটে ফেলছে নিজেকে— ফিরে যেতে পারে সে পুরাণে— যা নাকি আমাদের ইতিহাস। আর *মেধাবীভূত ও মাধবীলতা*-য়ও ইতিহাস আছে। তার সঙ্গে সমসাময়িক কিছু ঘটনা, সমসাময়িক কিছু জিনিস সেই ইতিহাসকে জেরা করছে। এবার *অপারেশান রাজারহাটে* আমি স্বাধীনতাটা একটু বেশি নিয়েছি। স্বাধীনতাটা বেশি নিয়ে কী করেছি— ইতিহাসের ঘটনার সঙ্গে কল্পনা, বর্তমান সময় ইত্যাদিকে যেন একটা— একটা রাসায়নিক বিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নিয়ে যেতে হয়েছে। একটা অন্য ধরণের কিছু করা। অন্য কিছু সৃষ্টি করা—এরকম কিছু ব্যাপার এই উপন্যাসে আছে। যেটা তুলনামূলক ভাবে *মেধাবীভূত ও মাধবীলতায়* কম আছে। এখানে সেটা বেশি আছে। কিন্তু এমন ভাবে আছে যেটা বাহ্যত ধরা পড়বে না। কিছু under current-ও আছে; একটা কথা বলা হচ্ছে আর একটা কথা ভেতরে ভেতরে চলছে। এটাকে বলা যেতে পারে একটা picarex ধরণের novel। মোহর নামে যে চরিত্র— দুটো চরিত্র আছে তো, একটা point, আর একটা counter point। মোহর যদি point হয় তাহলে ননী সাহা counter point। এবার মোহর ননী সাহাকে জানবার চেষ্টার ভেতর দিয়ে ননী সাহার ব্যাপারটা বুঝবার চেষ্টা করতে গিয়ে, পুরো রাজারহাট উপাখ্যানটা তাকে জানার ও বোঝার চেষ্টা করতে হচ্ছে। আর পাঠক মোহরকে অনুসরণ করতে গিয়ে একের পর এক নানা ঘটনায় ইতিপূর্বে অকথিত রাজারহাটকে দেখতে পাচ্ছে। এবার মোহরের এই দেখতে পাওয়াটা— বর্তমান থেকে অতীতে যাওয়া, কারণ ঘটনাগুলো ঘটে যাওয়ার পরে সে যাচ্ছে, যাদের কাছে যাচ্ছে সেটার কথা বলতে গিয়ে তারা আরও অতীতের কথা বলে ফেলছে। তারা সেই অতীত থেকে ভবিষ্যতের কথা বলছে। কাজেই সময়ের একটা খুব ঘূর্ণি আছে। সময়ের সেই ঘূর্ণিটার ভেতর দিয়ে আমরাও যাচ্ছি। এবং এর ভেতর দিয়ে যে আমরা যাচ্ছি, সেই প্রক্রিয়ায় আমাদেরও আর অ্যাঙ্কর থাকছে না, আমরাও কিন্তু

... নীলায়ন প্রকল্পকে জোরদার করতে তিনি নতুন এক নিয়মের খসড়া বানিয়েছেন। নতুন নিয়মে কুঠি মালিকের কাছে দাদন নেওয়া চাষা যদি নীলচাষে গাফিলতি করে... তাহলে নীলকর সাহেব ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে নালিশ করতে পারবেন। ম্যাজিস্ট্রেট এ-ব্যাপারে যে রায় দেবেন সেটাই চূড়ান্ত, এ নিয়ে আর আপিল করা চলবে না। চাষার গাফিলতি চুক্তিভঙ্গ প্রমাণিত হলে দাদনের পাঁচগুণ টাকা সাহেবকে ফেরত দিতে হবে। ... না পারলে ছ-মাস জেলে গিয়ে ঘানি টানতে হবে।... মাধবী, এখনকার যেমন কারখানা চাষ, জমি অধিগ্রহণ, পুলিশ দিয়ে পিটিয়ে চাষার মাজা ভেঙে দেওয়া। এ ছাড়া উপায়ই বা কি? ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া ২৯/০৩/১৮৬০-এ এই বিলের গাওনা গাইতে গিয়ে লিখেছিল, The ryots, always as capricious as children ... রায়ত অর্থাৎ এক্ষেত্রে চাষারা খ্যাপাটে, খেয়ালি অস্থিরমতি এমনই যে তাদের উপর ভরসা করা যায় না। মাধবী তুমি বিড়বিড় করলেও আমি বুঝতে পারি, হ্যাঁ, তুমি ঠিকই ধরেছ দেশ স্বাধীন হওয়ার এত বছর পর ওইটুকু তফাত হয়েছে, শাস্তিটাই একমাত্র পথ না ভেবে তার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে বোঝানোর গপ্পো, পাখি পড়া করানোর গপ্পো কিন্তু চাষা মালটা যে-মুখ্য সেই মুখ্যই রয়ে গেল। ভালো মন্দের জ্ঞান হল না, তখন নীলায়নের বার্তা পড়তে পারেনি, এখনও শিল্পায়নের বার্তা পড়তে শিখল না। ওই জন্যই তো পার্টি কত করে বই ধরতে বলল... তবে হ্যাঁ, বদবুদ্ধি দিয়ে দেখ, সঙ্গে সঙ্গে চাষাভুষোরা লুফে নেবে। নীলায়ন প্রকল্পে জল ঢালতে যেসব বুদ্ধিজীবী চাষাদের শলা দিচ্ছে সে ব্যাটাদের ধরে ধরে জেলে পোরার ব্যবস্থাও একেবারে পাকা করা হয়েছে। আর তুলনা করতে যেও না মাধবী, সব সেই এক, হিস্ট্রি অলওয়েজ রিপিটস ইটসেল্ফ। এমনকি তোমাদের সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম-লালগড় মডেলের আদি-ধাঁচা সেই নীল বিদ্রোহই।...

'মেধাবীভূত ও মাধবীলতা', ২০১১।

নোঙরহারা হচ্ছি, এবার এই পুরো জার্নিটা এই উপন্যাসে ধরা হচ্ছে কিন্তু কতকগুলো বাউলগানের একটা করে লাইনে। বাউলদের সম্পর্কে একটা ছোটো, একটা সোজা, একটা গোদা কথা সবাই জানে। তাদের চিন্তা, তাদের ধ্যান যা, সেই চিন্তা-ধ্যান অনুযায়ী তারা সমাজের সঙ্গে মিলতে পারে নি। তারা তাই সমাজকে ত্যাগ করেছে। বা বাধ্য হয়েছে ত্যাগ করতে। সমাজ থেকে বেরিয়ে যাওয়াটাও তো একটা যাত্রা। সেই যাত্রাটার সঙ্গে এই যাত্রাটা জুড়েছি। বা সেই যাত্রার সঙ্গে এই যাত্রাটাকে মেলাতে চেয়েছি। যাতে করে এটা একটা মহাযাত্রা হয়। আর আমাদের কাছে যাত্রা হচ্ছে একটা শিল্প। মানে গ্রামাঞ্চলে নানা রকম উৎসবে যাত্রা বেরোতো। রাসযাত্রা কথাটাও মনে পড়ছে। সেই গান গাইতে গাইতে চলেছে, কিছু করতে করতে চলেছে---এমনকী বিয়েরও যাত্রা আছে— এটাও কিন্তু সেই অর্থে ওই যাত্রা। সমস্ত লেখাই সেই যাত্রা, আমি সেই মহাযাত্রায় অকিঞ্চিৎকর পথিক।

তরুণ : গ্রামাঞ্চলের কিছু সংস্কৃতি আছে সেটাকে আমরা কিছুতেই শহুরে চোখ দিয়ে বুঝতে পারব না। তাদের এই culture এর সঙ্গে যে একাত্মবোধ একজনের সঙ্গে আর এক জনের—

রাঘব : সহজ উদাহরণ হচ্ছে পটের ছবি ফ্ল্যাটের দেওয়ালে টানিয়ে রাখা। বাঁকুড়ার মাটির ঘোড়া বৈঠকখানায় রাখা। বাউলকে বৈঠকখানায় ডেকে এনে গান শোনা। এখানে একটা point আছে— context-এর point। অর্থাৎ এটাকে তুমি কিছুতেই context-এর বাইরে বুঝতে পারবে না। যদি বাউলকে বুঝতে হয় তাহলে বাউলের জায়গাতেই গিয়ে বুঝতে হবে। তার আখড়ায় যেতে হবে। সে গ্রামে যখন গান গায় ঘুরে বেড়ায় তখন দেখতে হবে। গ্রামের মানুষকে বুঝতে গেলে তারা যেভাবে থাকে, জীবনযাপন করে যে ভাবে সেটা দেখে, তার মধ্যেই তাকে বোঝার চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু যদি তার সংস্কৃতিটাকে শহরে নিয়ে এসে বোঝার চেষ্টা করি, মিউজিয়াম বানাই— তাহলে মিউজিয়ামই হতে পারে। একটা বিশেষ context নির্ভর এই সংস্কৃতি সেখানকার যাপনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কে জড়িত। এই উপন্যাসে সেই মিউজিয়ামটার কথাও আছে। ননী সাহা-র পরিকল্পনা ছিল একটা মিউজিয়াম বানিয়ে দেওয়ার, সেটা ইউরোপে যেমন হয়, চাষি সেজে কেউ বসে থাকবে, এ থাকবে ও থাকবে, পুরো জিনিসটা ওখানে থাকবে। রাজারহাটের মানে অতীতের রাজারহাটের একটা ক্ষুদ্র সংস্করণ, মিউজিয়ামের মতো বানাতে চেয়েছিল সংরক্ষণের জন্যে। এই সংরক্ষণে তো এটা হবে না। কাজেই এর সমস্ত possibilities-গুলোও কিন্তু উপন্যাসটায় explore করা হয়েছে।

তরুণ : জীবন-যাপন, সংস্কৃতি থেকে উচ্ছেদ তো অনেক অনেক দিন ধরে হয়ে আসছে, সাম্প্রতিক অনেক ঘটনাই আছে। তবু বিশেষ ভাবে রাজারহাটের বিষয়টাই তোমার মাথায় এলো কেন?

রাঘব : আমি এই রাজারহাট অঞ্চলের বাসিন্দা— সেই ১৯৮১ সাল থেকে। এখানে থাকার সূত্রে অনেকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় ইত্যাদি হয়েছে। এবং কখনও কখনও এই অঞ্চলের কাছে বা দূরের কোনো গ্রামেও গেছি, কিছু লোকের সঙ্গে ভাব-ভালোবাসাও হয়েছে। রাজারহাটে যখন জমি অধিগ্রহণ শুরু হলো সেই শুরু হওয়ার সময় থেকেই যা যা ঘটছিল তার কিছু আঁচ আমি পেতাম। কিন্তু তখনও পর্যন্ত শুরুতে আমি বুঝতে পারিনি, এর ব্যাপকতা কতটা। প্রকল্পটা কত বড়ো হতে চলেছে। কোনো আন্দাজ পাচ্ছিলাম না। কিছুদিন যাওয়ার পরে যখন এটা বড়ো হলো এবং 'রাজারহাট জমি বাঁচাও' আন্দোলন শুরু হলো, তার কমিটিও হলো, তারা সভা করতে লাগল বিভিন্ন জায়গায়, তাদের সেই সভাটভাতেও গেছি। একটা অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে যে, পশ্চিমবঙ্গের এটা প্রথম ঘটনা— মানে গ্লোবালাইজেশনের সূত্রে, লগ্নিপুঁজি আকর্ষণ করতে সাহেব-সুবোর আরাম-বিরাম ও গতির প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র গড়ে দিতে হবে— এক পাঁচতারা শহর চাই, চওড়া রাস্তা চাই, দামী হোটেল, নাইট ক্লাব, চিকিৎসার দুর্দান্ত ব্যবস্থা সমেত প্রায় একটা আধুনিক ইন্দ্রপুরী চাই। সেই প্রকল্প, সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম তো প্রথমে নয়— প্রথমে রাজারহাট।

তরুণ : তারও আগে লবণহ্রদ?

রাঘব : লবণহ্রদ বা সল্টলেক প্রকল্পে তখনও পর্যন্ত Globalization ব্যাপারটা সে ভাবে আসে নি। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গে Globalization-এর হাত ধরে যদি কোনো নগরায়ণের পরিকল্পনা হয়ে থাকে সেটা প্রথমে রাজারহাটেই হয়েছে। এবং প্রথমদিকে এখানে কী হতে চলেছে সে ব্যাপারে সাধারণ মানুষেরও কোনো ধারণা ছিল না। যাদের জমি আছে, যাদের জমি গেছে, তারাও ঠিক বুঝে উঠতে পারে নি। যত সময় গেছে জিনিসটা বড়ো হয়েছে, স্থিরতা এসেছে, অনেক নির্দয়তা এসেছে—এবং রক্তপাতও ঘটেছে। ঘটেনি এমন নয়। কিন্তু এইটাকে কেন্দ্র করে যে আন্দোলন তখন হচ্ছিল— শিক্ষিত নাগরিক মধ্যবিত্ত সমাজের সমর্থন এই আন্দোলন টানতে পারে নি। নাগরিক সমাজের সহৃদয়তা থেকে তারা বঞ্চিত ছিল। এবং এই বঞ্চনার কারণে আন্দোলন এখানে নেহাতই স্থানীয় থেকে গেছে, কোনো ব্যাপকতা অর্জন করতে পারে নি। খবরের কাগজে কিছু কিছু খবর হয়েছে, সেগুলো খবর হিসেবে হয়েছে, টুকরো খবর হিসেবে। কোনো একটা incident ঘটলে সেটার খবর হয়েছে কিন্তু সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম যেভাবে খবরে স্থান পেয়েছে— টিভিতে স্থান পেয়েছে সেরকম পায়নি— এবং রাজারহাটের সময় মিডিয়া হিসেবে টিভি অতটা বড়ো ছিল না। রাজারহাটের সময় টিভির প্রভাব-প্রতিপত্তি যদি আজকের মতো হতো— তাহলে ঘটনাক্রম অন্যদিকে গড়াতেই পারত। নগরায়ণের এই ঘটনাটা বহু লোককে তাদের নিজস্ব পেশা এবং সংস্কৃতি— এই দুটো থেকেই উৎখাত করেছিল। এরকম বেশ কিছু চরিত্র আমি দেখেছি চোখের সামনে, এবং এই অঞ্চলটার সঙ্গে আমি আছি এতদিন ধরে— কাছাকাছি এবং জানতে পারছি সব কিছু। তো একজন নাগরিক হিসেবে আমার মনে হয়েছিল, এখানে এই যে একটা নগরায়ণ হলো— নগরায়ণের নির্দয় প্রচেষ্টা হলো— একটা পুরোনো সময় ধিকিধিকি করে এখানে টিঁকে ছিল সেই সময়টাকে সরিয়ে দিয়ে বাজার অর্থনীতির যে জয়যাত্রা এখানে শুরু হলো, তার জন্যে যা যা মূল্য দিতে হচ্ছে এবং এই গোটা কাণ্ডকারখানায় যে এত অজস্র রকমের স্বপ্ন এসে জড়ো হলো সেটা যেমন একটা খুব মহাকাব্যিক ব্যাপার— তেমনই এর একটা ক্রিটিক থাকা উচিত যা সমস্ত প্রতিবাদের স্বরকে আশ্রয় করে গড়ে উঠবে। এই মহাকাব্যিক ব্যাপারটা কোনো লেখকের পক্ষে এড়িয়ে

যাওয়া সম্ভব নয়। আমাকে এই ব্যাপারটাই টেনেছিল এবং মনে হয়েছিল যে, যেহেতু আমি এর আঁচ পেয়েছি অনেকদিন ধরে, খোঁজ পেয়েছি অনেক জিনিসের এবং খোঁজ করলে আরও অনেক কিছু জানতে পারব, আমার উচিত হচ্ছে যে, এই ঘটনাটা, এই অভিজ্ঞতাটা, এর যে জটিল বিচিত্র বহু দিক রয়েছে এই সব নিয়ে সাধ্যমতো চেষ্টা করা— একটা আখ্যানে নিয়ে আসা। বা অনেক আখ্যানের মধ্যে এটা আনা। যে গল্পটার মধ্যে একটা গাছের গল্পও থাকতে পারে। আছেও। মাটির গল্প থাকতে পারে। আছে। কারণ একটা প্রাচীন সময় অনেক দিন ধরে এখানে ধিকি ধিকি টিকে ছিল। তাকে হয় তো যেতেই হতো। এ হয়তো অনিবার্যই ছিল। সেই অনিবার্যতা এক জিনিস--- অনিবার্যতার কারণে রক্তপাত, যন্ত্রণা, উচ্ছেদ তো তুচ্ছ হয়ে যায় না।

আর, পাঠকের বুদ্ধিদীপ্ত, লাবণ্যময় বা ভোঁতা মুখের কথা ভেবে আমি কখনও এক লাইনও লিখিনি। লিখতে পারি না। আমার লেখার পাঠক সাকুল্যে বাহান্ন কি তিপান্ন জন এবং যাহা বাহান্ন তাহা তিপান্ন! এক প্রাচীন অতিশয় বুড়োটে ও তামাদি ঔচিত্য বোধ থেকেই লিখি--- এটা লেখা উচিত, এটা আমার কর্তব্য, না হলে নিজের কাছে মুখ দেখাতে পারব না। *কমুনিস* যে কারণে লেখা *অপারেশান রাজারহাট*ও আমার সে-কারণেই লেখা। এই অভিজ্ঞতা, এই তত্ত্ব, এই ইতিহাস, এই কল্পনা, মিথ, এই জীবন-যাপন এ সব হারিয়ে যাবে। এগুলো কোথাও একটা নথিবদ্ধ থাকা দরকার। *কমুনিস*-এর থেকে *অপারেশান রাজারহাট* স্বতন্ত্র, বহুমাত্রিক। *কমুনিস*-এ একটা এক- মাত্রিকতা ছিল। অর্থাৎ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহ। সেই বিদ্রোহীদের গল্প এবং বিদ্রোহীদের জীবন—মাও-তে-তুঙের ভাষায়, বিদ্রোহী যদি মাছ হয় তার জল স্বরূপ যে জনগণ ছিল, তাদের মধ্যে বিচরণ করত সেই urban গেরিলারা। তারা আর গরিব মানুষ, এই দু'জনের কথা, এই দু'পক্ষের কথা আছে। *অপারেশান রাজারহাটে* কিন্তু পক্ষ একটা-দুটো নয়—পক্ষ বহু। এই উপন্যাসের কোথাওই উন্নয়নের গল্পটাকে একমাত্রিক ভাবে দেখা হয় নি। এবং তাকে একতরফা তেড়ে গাল দেওয়া বা নিন্দা করার জন্যেও এই উপন্যাসটা লেখা হয়নি। Mostly লেখা হয়েছে, এই মানুষদের কথা বলবার জন্য। এদের অভিজ্ঞতার কথা বলবার জন্যে। উন্নয়ন কোন্ পথে কি সেটা উন্নয়নবিদ্ যারা তাঁরা বিচার করবেন। লেখক হিসেবে সেই দায়িত্ব আমি নিইনি আর মনেও করিনি সেটা আমার কর্তব্য। আমার কর্তব্য হচ্ছে— এই শরণার্থীদের যে যাত্রা চলছে— বহুদিন যাবৎ, তাতে নতুন সংযোজন রাজারহাট। এবং আমার *শৈশব* উপন্যাসে শরণার্থী আছে, মানে দেশভাগের ব্যাপারটা। আমরা উৎখাত হয়ে এসেছিলাম—সেই গল্পটা ছিল। যেহেতু আমি নিজের দেশ হারিয়েছিলাম সেই জন্যে রাজারহাটের মানুষও যখন তাদের জমি হারায়, তাদের দেশ হারায়, তখন সেটা হয়তো আমার কাছে এক হয়ে যায়। অন্তত personal element-এর মধ্যে থাকতে পারে। এইসব মিলিয়ে আমার মনে হয়েছে— এটা একটা মহাকাব্যিক ব্যাপার। এর বহু মাত্রা আছে এবং আমার সাধ্যমতো চেষ্টা করা উচিত যে, একে এমন একটা ভাবে লিপিবদ্ধ করা যাতে নগর সভ্যতার এই এপিসোডটি, এই নব্য পুরাণকথা বেঁচে থাকে। এ তো শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, রাজারহাট নয়, এই গল্প আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকা, চিন, কোথাকার যে নয়। এই, এই ভাবেই রাজারহাট লেখা।

তরুণ : সমসাময়িক এত বড়ো একটা ঘটনা যেটা নিয়ে অন্য কেউ কোনো উপন্যাস, এমনকী কোনো ছোটো গল্পও রাজারহাট নিয়ে বেরোয় নি। আমার চোখে অন্তত পড়েনি। দু'চারটে ছোটো প্রবন্ধ— documentation -এ যার নামগুলো এর বইয়ের ভেতরে এসেছে, নীলোৎপল দত্ত বা এরকম কয়েকজন যারা কাজ করছে— তাদের লেখা। *অপারেশান রাজারহাট* উপন্যাসে বিভিন্ন চরিত্র, তাদের উচ্ছেদ হওয়া, যেটা কিছুটা documentation, আবার documentation-এর বাইরে পুরো perspective-টাকে বোঝার জন্য বিভিন্ন ঘটনা, চরিত্র ইত্যাদি এসেছে। পাচ্ছি শরণার্থীর মিছিল—*মেধাবীভূত ও মাধবীলতা*-র ভেতরেও যেটা এসেছে সেই নীলচাষের সময় থেকে এই আজ পর্যন্ত চলে আসা শরণার্থীর মিছিল। এই বিষয় নিয়ে, তোমার কি মনে হয় সিরিয়াস, সমাজতাত্ত্বিক উপন্যাস বাংলায় খুব কম?

রাঘব : আমার সেটা মনে হয় না। বাংলা উপন্যাসে একটা সমস্যা হলো যে, সমাজ অনেক বেশি লেখার মধ্যে জায়গা জুড়ে নেওয়ার ফলে সাহিত্যের যে রূপ, সাহিত্যের যে ভাষা সেইটা নিয়ে একটু চর্চা করা মানে কী করে লিখব বা কী করে লেখাটাকে অনন্য করে তোলা যায়— লিখনের রূপ নিয়ে ভাবা সেটা অনেক সময় কম গুরুত্ব পেয়েছে। তার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্ব পেয়ে গিয়েছে, সমাজ বাস্তবতা। এটা আধুনিক বাংলা সাহিত্যের (যা পাঠক-পোষ নয়) একটা অংশ অন্তত, সেটা বেশ বড়ো। এরকম মতও আছে যে, আমাদের এখানে লিখতে গেলেই গলির পঞ্চার কথা লিখতে হবে, না হলে হবে না। এটা হয়তো ঠিক না, তবে আছে এরকম একটা মত। কাজেই যেখানে এরকম একটা মত রয়েছে, এ নিয়ে লেখা যায় না--- এখন যেটা হয় আর কি, স্বভাবতই এই সব জিনিস যাতে আছে, সেই সব লেখা আপামর পাঠকের কাছে অনেক সময় পৌঁছোয় না, তার কারণ হচ্ছে যে, culture industry যে ধরণের লেখাকে promote করে, বড়ো পাবলিশাররা সেই সব লেখাই ছাপে, সাধারণ ভাবে যে সব উপন্যাস অনেক বিক্রি হবে। বাজারের দিক থেকে তাদের আগ্রহও সেই সেই সব লেখার দিকেই। আর আমরা এখানে যে সব লেখায় আগ্রহী তা তো অনেক বিক্রি হয় না। আর বিক্রি বাড়াতে গেলে লেখাকে সুখপাঠ্য হতে হবে—যাকে আমরা বলতে পারি পাঠক-পোষ লেখা। পাঠকের সঙ্গে যে লেখা অনাক্রমণ চুক্তিতে বদ্ধ হবে না, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে যাবে না, সেই লেখা পাঠক সাধারণ ভাবে নেবে না। সংবাদপত্র জগতের রিডার্স ফ্রেন্ডলি কথাটার এই হচ্ছে মোদ্দা মানে। এরকম পাঠক নিশ্চয়ই আছে সংখ্যায় যত অল্পই হোক— যাদের জন্যে আমরা লিখি, যে পাঠক আমন্ত্রণ জানায় তার অভ্যাস, তার চিন্তাকে আক্রমণ করা হোক, তাকে বিব্রত করা হোক, তার শান্তি আক্রান্ত হোক। সক্রিয় এই পাঠক সজ্ঞানে বা নির্জ্ঞানে নিজেও লেখক। এই লেখক-পাঠক মার্জিনে লেখার অবকাশ সন্ধানী। যে বইটি সে পড়ছে সেই লেখার ফাঁকে ফাঁকে সে নিজে লেখে। অদৃশ্য কালিতেও হতে পারে। তাই একে বলে লেখক-পাঠক। আমরা, আমাদের মতো

লেখক যারা তারা লিখি কিন্তু লেখক-পাঠকের জন্যে। সেদিক থেকে আমরা সংখ্যালঘু। এটা মেনে নেওয়া ভালো। এবং এটা মেনে নেওয়ার মধ্যে সবদিক রক্ষা হয়। অন্যদেরও গাল পাড়তে হয় না আর নিজেকেও বোঝা যায়। এই সংখ্যালঘু লেখকদের মধ্যে এটা থেকেছে— তারা কাজ করেছেন, করেননি তা নয়। কারণ আমি বলতেই পারব না যে, রাজারহাটের এই বিশাল ঘটনা কারও গল্পে আসেনি, নিশ্চয়ই এসেছে। যদিও আমি পড়িনি। কেউ হয়তো উপন্যাসও লিখে থাকতে পারে আমি জানি না। সমস্ত লেখা তো ওরকম ভাবে আমাদের এখানে আসে না। খুব ছোটো জায়গা থেকে বেরোতে পারে ইত্যাদি ইত্যাদি। কাজেই এটাই একমাত্র লেখা কিনা সেটা বলতে পারব না। হতেও পারে সেটা।

তরুণ : যা বেরোয় মোটামুটি একটা জানা তো যায় কোনো না কোনো সূত্রে। সবটা হয়তো জানা যায় না।

রাঘব : হতে পারে, আমার জানা নেই।

তরুণ : *শৈশব, বাদার গল্প, থেকে মেধাবীভূত ও মাধবীলতা* হয়ে *অপারেশান রাজারহাট*-এও উচ্ছেদ, শরণার্থীর মহামিছিল— কেন বার বার তোমার লেখায় ফিরে ফিরে আসে উচ্ছেদ, শরণার্থীর মিছিল, গ্রামকে শহরের ভেতরে ঢুকিয়ে ফেলার ষড়যন্ত্রের কথা?

রাঘব : *মেধাবীভূত ও মাধবীলতা*, যদি *শৈশব* থেকে ধরা যায়, যেটা তুমি বললে, এই যে মানুষের একটা মহামিছিল, সেই মিছিলটা একটা শরণার্থীর মিছিল। এই শরণার্থীর মিছিল বহুকাল ধরে চলছে। এটা চলছে গুহামানবদের কাল থেকেই, এবং আজও শেষ হয়নি। *শৈশব* উপন্যাসটা যখন লিখি তখন, রাষ্ট্রনৈতিক কারণে যে উচ্ছেদ সেইটা, কারণ আমাদের বাস ছিল পূর্ববঙ্গের ফরিদপুরে। তো আমি আমার ছোটোবেলায় মায়ের মুখে, আত্মীয়স্বজনের মুখে— পূর্ববঙ্গের কথা শুনেছি। সেই পূর্ববঙ্গে কিন্তু আমি জন্মাইনি। কোনোদিন যাইওনি— কিন্তু ভাষার এমন জাদু, ভাষার এমন শক্তি যে শুধুমাত্র তাদের মুখে, তাদের স্মরণে ওগুলো শুনে শুনে— আমার কাছে একটা জলজ্যান্ত দেশ সেটা। এবার সেই দেশ হারানোর একটা দুঃখ আমার বাল্যকাল থেকেই ছিল— সেই দেশটা তখন আমার কল্পনার দেশ ছিল! যেহেতু সেই দেশ আমি দেখিনি। সত্যিই বাস্তবে সেটা একটা imagined country আমার কাছে। সেই কল্পনার দেশ থেকে আমি শুরু করেছি, সেখান থেকেই উচ্ছেদ হয়েছি। আর এরা, এই মানুষগুলো, রাজারহাটে, বাস্তবের দেশ থেকে চ্যুত হয়েছে। তো সেই *শৈশব* থেকে এই পর্যন্ত যদি একটা যাত্রা রেখা টানা যায়, সেটা টানাই যেতে পারে, এবং এখানে একটা মজার ব্যাপার ঘটেছে, কী কারণে ঘটল আমি জানি না, মানে যাকে বলে ভৌতিক কাণ্ড— ভৌতিক কাণ্ড জীবনে ঘটে— সেটা হচ্ছে যে, *মেধাবীভূত ও মাধবীলতা* এই উপন্যাসটা আমার লেখবার কথা *অপারেশান রাজারহাট*-এর পরে, কিন্তু এটা আমি লিখেছি *অপারেশান রাজারহাট*-এর আগে। যখন *মেধাবীভূত ও মাধবীলতা* লিখছি, তখন এই যে এমন অদৃশ্য হয়ে যাওয়া, গ্রাম মুছে যাওয়া, গ্রামের না থাকাটা, এইটা একটা বাস্তবতা হিসেবে আসছে। আমার চিন্তা ও কল্পনায় এই সত্যটা এরও আগে থেকেই আসতে শুরু করেছিল। পেশাগত কাজে আমি গ্রামাঞ্চলে অনেক ঘুরেছি। *বাংলার মুখ* নামের বইটার কথা তুমি জান। ১৯৮০ থেকে আমি এটা feel করতে থাকি, '৮৫-তে ভালো রকমই স্পষ্ট হয় যে, গ্রামজীবনে এমন কতকগুলো পরিবর্তন হচ্ছে, যার ফলে গ্রামটা আর গ্রাম থাকছে না। গ্রামটা আর সেরকম থাকবে না। এখন এই না থাকার নানারকম অর্থ হতে পারে। গ্রামটা আর গ্রাম থাকছে না বলে নস্টালজিক একটা ব্যাপার থাকে আমি সেটার কথা কিন্তু বলছি না। গ্রাম তো ভালো অর্থে বদলাবে নিশ্চয়ই। গ্রামের লোকদের অনেক রকম সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার কথা—আধুনিক সুযোগ-সুবিধা তারাই বা কেন পাবে না, সেটা পাওয়া উচিত। কী ভাবে পেতে পারে না-পেতে পারে সেটা স্বতন্ত্র প্রশ্ন। কিন্তু আমি যেটা বলতে চাইছিলাম—গ্রামের মৃত্যু যেন আমি টের পাচ্ছিলাম, যে, গ্রামটা বাঁচবে না। গ্রাম অদৃশ্য হয়ে যাবে। হারিয়ে যাবে। এটা আমাকে একবার সোমনাথ হোড় বলেছিলেন, সেটা অনেককাল আগে, শান্তিনিকেতনে, ১৯৮৪ সালে। ওঁর কথাটা আমার মাথায় গেঁথে গিয়েছিল, আর সোমনাথদা তো গ্রাম ঘোরা মানুষ। আমাকে বলেছিলেন, 'রাঘব তুমি গ্রাম গ্রাম করছ, এটা কি গ্রাম! এ তো বস্তি। এবং শহরের বস্তির চেয়েও খারাপ।' কিন্তু বস্তিও রাখা যাবে না, এটা আমি দেখেছিলাম একটা গ্রামে। খবরের কাগজে তার ছবিও ছাপা হয়েছিল, একটা গ্রাম— তারা প্লাকার্ড টানিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে যে 'এই গ্রাম বিক্রি আছে'। একটা গ্রাম—সেই গ্রামটাতে চলছে ভূতের আধিপত্য। আসানসোলের দিকে একটা গ্রাম, একটা স্টোরি হয়েছিল, সেখানে নাকি কেউ থাকতে পারছে না। ভূতের উৎপাত সাংঘাতিক। সুতরাং গ্রাম ছেড়ে সব পালাচ্ছে। আগে বলছে গ্রাম বিক্রি হচ্ছে, এবার বিমূর্ত ভাবে, যে, সোমনাথদা বলেছেন 'গ্রাম বস্তি হয়ে যাচ্ছে, গ্রাম নেই।' এ বলছে 'গ্রাম বিক্রি আছে।' আর ও বলছে গ্রামে ভূত থাকছে মানুষ থাকতে পারছে না। এই জিনিসগুলো মাথার মধ্যে কাজ করছিল। করতে করতে আমার কাছে একটা অন্য ছবি স্পষ্ট হতে থাকল। আমাদের এখানে গ্রাম নিয়ে সাহিত্য অনেক হয়েছে। বিশেষত তারাশঙ্করের লেখার পরে, তারাশঙ্করের অন্ধ অনুকরণকারী অনেক লেখক তৈরি হয়েছিল; যারা বেশির ভাগই হচ্ছে— আমি বলি বিডিও লেখক। তো এরা গ্রাম নিয়ে অনেক লিখছে। তো সেইসব লেখা, মানে কী হচ্ছে যে, গ্রামের পরচা, দলিল অমুক তসুক, সে সবের বিবরণ আছে, এটা সেটা আছে, জার্নালিস্টিক লেখা, কিন্তু গ্রামটা সাহিত্যে আর কোনো নতুন রূপ নিচ্ছে না। মানে তারাশঙ্করের একটা দুর্বল extention, সেটা লেখকের ক্ষমতা অনুযায়ী কম বা বেশি দুর্বল বা ভালো হচ্ছে— আমি অনেকদিন ধরে ভাবছিলাম গ্রামকে অন্যরকম ভাবে represent করা যায়, অন্যরকম ভাবে গ্রামের রূপ দেওয়া সম্ভব। আর গ্রাম দাবিও করছে সেটা। এইবার *মেধাবীভূত ও মাধবীলতা*-য় যে চরিত্রটি যাচ্ছে গ্রাম নিয়ে লেখবার জন্যে রেকি করতে, সে পড়ছে ভূতের খপ্পরে এবং সে এমন একটা গ্রামে গিয়ে পড়েছে যে গ্রামটায় কেউ নেই। গ্রামটা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। গ্রামটা ভূতের গ্রাম হয়ে গেছে। নতুন যে উপন্যাসটা সে লিখবে তারই জন্য রেকি করতে গেছে। সেখানে তার চরিত্ররা আসছে, যে উপন্যাসটা সে লিখবে সেই উপন্যাসটার চরিত্ররা আসছে, এসে লেখকের সঙ্গে কথা বলছে, নিজেদের মধ্যেও কথা বলছে, একটা ভৌতিক উপন্যাসের সংলাপ

চলছে। শেষ পর্যন্ত উপন্যাসটা সম্ভবত আর লেখা হয় না। কিন্তু উপন্যাস লিখতে গিয়ে লেখক ভূতের খপ্পরে পড়ে এবং নানারকম ভাবে গ্রামেরই গল্প ঘুরেফিরে আসতে থাকে, এবং তার মধ্যে গ্রামটার একটা ইতিহাস আছে, একটা documentation আছে এবং একটা global village ব্যাপার আছে। এই যে সারা পৃথিবীতেই একটা নগরায়ণের ঝোঁক এখন, সারা পৃথিবীই যেন নগর হয়ে উঠতে চাইছে, এই যে ঝোঁকটা, সেই ঝোঁকটা এই রকম ভাবে গ্রামকে নিশ্চিহ্ন করে। এই পরিস্থিতিতে যদি একটা গ্রামের কল্পনা করি— কল্পনাই। কিন্তু এই কল্পনার গ্রামটা তো পাওয়ার কথা *অপারেশান রাজারহাট*-এর পরে। আগে আমাদের গ্রামগুলো নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, গ্রামগুলো হাওয়া হয়ে গেল, রইল না—নাম পালটে গেল, লোকগুলো সরে গেল, জীবিকা নষ্ট হয়ে গেল, কিন্তু *অপারেশান রাজারহাট* লেখা হলো পরে, তার আগে *মেধাবীভূত ও মাধবীলতা* লেখা হলো। আমি বলব যে এটা পড়তে হবে, মানে শৃংখলাটা হবে—আগে *অপারেশান রাজারহাট* পড়ে নিয়ে তারপরে *মেধাবীভূত ও মাধবীলতা* পড়তে হবে।

তরুণ : গত তিরিশ বছরে ভারতে নগরের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে গেছে— নগরায়ণের সঙ্গে সঙ্গে শরণার্থীর মিছিল দীর্ঘতর হয়েছে। সেই গুহামানব থেকে—সেই মিছিলটা চলছে। উচ্ছেদের ব্যাপারটা। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে, নীলচাষে গ্রাম উচ্ছেদ হয়েছে, চাষি উচ্ছেদ হয়েছে। গ্লোবালাইজেশানের আগে উচ্ছেদ হওয়া, আর তার পরে উচ্ছেদ হওয়া দু'টোর মধ্যে আমার কাছে বিশেষ তফাত নেই— কারণ উচ্ছেদটা উচ্ছেদই। আর উচ্ছেদ হয় সব সময় প্রান্তিক মানুষেরা। নগর দিয়ে গ্রাম ঘেরার ক্ষেত্রেও গ্রামের মানুষ উচ্ছেদ হয়ে শহরের ঝোপড়ির বাসিন্দা হয়ে গেছে। আবার *অপারেশান রাজারহাটে* মজুর থেকে চাষি হয়ে যাওয়ার ঘটনা আছে। চাষি থেকে শ্রমিক, শ্রমিক থেকে শ্রমিক, আবার শ্রমিক থেকে চাষি। History কি repeats itself --- উচ্ছেদের মিছিল তো সেই আদিম যুগ থেকেই চলছে। ইতিহাসের এই পুনরাবৃত্তি এদেশে তাহলে বার বার ঘটেছে। ঠিকই, কিন্তু এক স্রোতে কি তুমি দু'বার স্নান করতে পার?

রাঘব : কিন্তু স্রোতে তো দু'বার স্নান করো। স্রোতটা তো আছে। স্রোত এক হোক আর নাই হোক। *মেধাবীভূত ও মাধবীলতা*-য় তুমি যে উচ্ছেদ বৃত্তান্ত পাচ্ছ, নীল চাষ থেকে শুরু করে বা অন্যান্য কিছু, তো, নীলচাষের উচ্ছেদে একটা ব্যাপকতা ছিল— *মেধাবীভূত ও মাধবীলতা*-য় যেটা আছে তার মধ্যে নীলচাষটাই একটু ব্যাপক ঘটনা। বাকি সবই খুব localized, স্বল্প পরিসরে আবদ্ধ বা দু'পাঁচটা উচ্ছেদের ঘটনা। অন্য ধরণের সামাজিক অন্যায় অবিচার সেগুলো তো ছিলই—সে গল্পগুলো তো ওখানে আছেই। কিন্তু *অপারেশান রাজারহাট*-এর মতো ঘটনা একটা সভ্যতার পত্তনের মতো। একটা সভ্যতা ছিল সেটাকে সরিয়ে দিচ্ছি, সরিয়ে দিয়ে প্রতিষ্ঠা করছি আর একটা, যেটাকে নগরায়ণ বলছি। নগর সভ্যতা বলছি। ছিল একটা গ্রাম সভ্যতা— যদি আমরা এরকম ভাবে ভাবি, শহরের উপকণ্ঠে একটা গ্রাম সভ্যতা, সেই গ্রাম সভ্যতাটাকে আমরা শেষ করে দিচ্ছি, সেটাকে উৎখাত করে দিচ্ছি বা সেটাকে রাখার প্রয়োজন মনে করছি না— তার বদলে আমি একটা নগর সভ্যতার পত্তন করছি। সেটা অনেক বড়ো গল্প— সেদিক থেকে। এবার এই গল্পটার মধ্যে আমরা একটা সভ্যতার ইতিহাসকে পেয়ে যাই। সভ্যতা এভাবেই হয়েছে---সবসময়ই এ ভাবেই হয়েছে। আমাদের চোখের সামনে, এরকম একটা জিনিসকে যখন দেখি তখন অনেক বড়ো একটা ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে যাই আমরা— অনেক বড়ো ইতিহাসের সাক্ষী। এবং যেটা ধরো বইতে একরকম পড়েছি, দেখেছি, এখন চোখের সামনে সেটা দেখতে পাচ্ছি। এটা তো বলাও হতো, শিল্পায়ন করতে গেলে রক্তপাত অনিবার্য। যেন রক্তপাত হওয়াটা কাম্য ছিল, যেন সেটা হওয়া উচিত। সেটা তো কখনই হওয়া উচিত নয়—এবার এই গল্পটা যখন বলাও হচ্ছে, তখন বোঝাই যাচ্ছে কোথায় চলেছি? এই ঘটনাগুলো ঘটছে, সুতরাং আমার একটা justification দরকার। অনেক বড়ো একটা কিছু করতে যাচ্ছি, তার জন্যে এটা আমাদের করতে হচ্ছে। এবার সভ্যতার দিক থেকে যদি আমি ভাবি, যে শিল্প বিপ্লবের জন্যে এত কিছু করা হয়েছিল, সেই শিল্প বিপ্লব শেষপর্যন্ত কতদূর কী রাখতে পেরেছে? এবং যে ধরণের শিল্প বিপ্লব

রাজারহাট থেকে তাহলে কার নির্বাসন হল? কারই-বা অভিষেক হল?

ননী সাহার জীবন-বৃত্তান্তে একটু একটু করে মোহর যত প্রবেশ করবে ততই এ-সংক্রান্ত গল্প শুনতে পাবে। পুঁজিমাহাত্ম্য বা পুঁজিপাঁচালি সূত্রে যেমন আবার উঠে এসেছে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নাম, ইংরেজ জমানা ও লুটপাটের গল্প। গল্পের ধর্মই এই। তার কোনো মৃত্যু নেই। এক গল্প আর এক গল্পকে ছুঁয়ে দেয়। সেটা থেকে গজায় আর এক গল্প। ইস্ট ইন্ডিয়া নয় ফিরে এসেছে অন্য কোম্পানি, যার মধ্যে দাউদের টাকা থাকাও অসম্ভব নয়।...

আবার, এত বড়ো একটা কাণ্ড ঘটাতে গেলে লাগবে সবাইকেই, গণতন্ত্র বলে কথা, এ তো আর চীন নয়। কিন্তু এই সবাই তো স্বপ্নের হিস্যাও বুঝে নেবে। জমিটুকু ছাড়া যার কিছু নেই, প্রাচীনেরও প্রাচীন ছুতোর-কামার-কুমোর-জেলে চাষিদের আরো পিছু হটা, হারিয়ে যাওয়া, মুছে যাওয়া অবধারিত। তারা কোনোভাবেই স্বপ্নের হিস্যা পেতে পারে না। তাদের মধ্যে কেউ-কেউ ডিপার্টমেন্টাল শপ, আবাসন কমপ্লেক্স ও কিছু কিছু অফিসে দারোয়ান-চাকর-ঝি-আয়া- ড্রাইভারের চাকরি পেলেও পেতে পারে। এদের সম্মতি নিয়ে জমি অধিগ্রহণ এক অবাস্তব প্রস্তাব।... ঘুর পথে আবার মোহর ফিরে আসে নিজের কাছেই এবং ইংল্যান্ডের শিল্পবিপ্লবের সময়কার উচ্ছেদ নির্দয়তার যে বৃত্তান্ত খুঁড়ে এনে পার্টি শিল্পায়ন সংক্রান্ত ক্ষয়ক্ষতি জাস্টিফাই করতে চেয়েছে, এখন সেই ক্ষয়ক্ষতি খুব একটা বেনাদায়ক বলে মনে হচ্ছে না। ... তাহলে কি চাষা মুছে যাবে? শহর আর নিত্যনতুন কারখানার এমন এক দেশ গড়ে উঠবে যেখানে চাষ জমির চিহ্নটুকু থাকবে না? বা, চাষারা তাদের জীবন ও কল্পনা দিয়ে পুঁজির এই লীলীর বিরুদ্ধে যে-পাঁচিল, যে বুদির কেল্লা গড়েছিল তা লোকচক্ষুর আড়ালে অনেক আগেই ভেঙে গুঁড়িয়ে গেছে। এখন কেবল অন্ত্যেষ্টি? এই মিনিমাম তাত্ত্বিক জিনিসটা না বুঝলে মোহরের পক্ষে ননীর জীবন বৃত্তান্তের বাহানায় এমন কিছু রচনা করা অসম্ভব, ...

'অপারেশান রাজারহাট', ২০১৩।

হয়েছিল সেই শিল্পকে আমরা এখন টেমসে ফেলে দিচ্ছি, এখন অন্য ধরণের শিল্পের কথা বলছি। সম্পূর্ণ অন্য ধরণের শিল্পের কথা। তাতে শ্রমিকের প্রয়োজনই হবে না। খুব কম শ্রমিক লাগবে এবং খুবই trained শিক্ষিত শ্রমিক লাগবে। সত্যি কথা বলতে কি যে, প্রলেতারিয়েত বলতে যেটা আমরা বুঝতাম সেটা বর্তমানের ও ভবিষ্যতের যে শিল্পের কথা আমরা শুনি তাতে সেই প্রলেতারিয়েত আর থাকবে কিনা সন্দেহ। সব্বাই তো নলেজ ওয়ার্কার হয়ে যাবে। প্রলেতারিয়েত আর কোথায় থাকবে?

তরুণ : তাহলে অসংগঠিত শ্রমিকের ক্ষেত্র বাড়বে। এখনই মোট শ্রমিকের শতকরা ৯২ ভাগ অসংগঠিত শ্রমিক সারা ভারতে।

রাঘব : তার কারণ হচ্ছে যত রকমের Odd job থাকবে, সমস্ত odd job distributed হয়ে যাবে marginal people এর মধ্যে। কেননা odd job গুলো distribute করে দিতে পারলে, সেটা সব থেকে কম পয়সায় করানো যাবে। সুতরাং odd job-গুলো distribute করে দাও। তার সুবিধে হলো এইটা যে, আমি যখন odd job distribute করে দিচ্ছি, সেই কাজ যে করবে, সে কোথায় করবে? নিজের জায়গায় বসে করবে। নিজের আলো খরচ করে করবে। তার জন্যে আমি workshop দিচ্ছি না। সব দিক থেকে সেটা আমার সুলভ হচ্ছে, যে, আমি কত সস্তায় জিনিসটা করাতে পারব। এবং সস্তায় কাজে চিনের সঙ্গে কেউ এঁটে উঠতে পারবে না। আলপিন থেকে এলিফ্যান্ট সবই তৈরি করছে। এই রূপান্তর তো তারা ঘটিয়েছে। এবং এখানেও তো আমরা দেখলাম যে, রাজারহাটে যে স্বপ্নের কথা বলা হয়েছিল, কৃষি জমির উপর থেকে চাপ কমানো, আধুনিক শিল্পে যোগ দেবে ইত্যাদি ইত্যাদি। কী করে আধুনিক শিল্পে যোগ দেবে? আধুনিক শিল্পে যে প্রশিক্ষণ দরকার তা এদের নেই। সেটা পাওয়ার জন্যে একটা minimum শিক্ষা লাগে, তা এদের নেই। সেটা দেওয়ার কোনো ব্যবস্থা নেই। তারা তাহলে কী হবে? তারা তাহলে ঝি-চাকর হবে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ঝি-চাকর হয়ে গেছে। আর ড্রাইভার হয়েছে। সেটাও আবার মাধ্যমিক পাশ না হলে হবে না, driving license পাওয়া যাবে না। আগে যা হয়েছে হয়েছে। এখন এই হয়েছে। এছাড়া তো আর কিছু আমি দেখিনি।

এইখানে একটা বড়ো রাস্তা হয়েছে। খুব দ্রুত পৌঁছে যাওয়া যাচ্ছে। ফলে মধ্যবিত্ত নাগরিক মানুষের নিশ্চয়ই সুবিধা হয়েছে। কিন্তু এই সুবিধে করতে গিয়ে আমরা পরিবেশের কত ক্ষতি করলাম। কত মানুষকে আমরা ঠকালাম। কত মানুষের জীবনের গল্প পাল্টে দিলাম। যেরকম ভাবে আমরা একটা বিশেষ ধরণের উন্নয়ন করতে গিয়ে নদী মেরে ফেলেছি। বন শেষ করে দিয়েছি। সে ভাবে মানুষের জীবনেরও কিছু স্রোত থাকে সে-রকম অনেক স্রোত— যার একটা নয় বহু সংস্কৃতি আছে--- যার জীবনযাপনের নানা ধরণ আছে— সেই বৈচিত্র্যকে আমরা শেষ করে দিলাম। সেটা তো একদিক থেকে আমি যেন বা একটা সভ্যতাকে খতম করেছি। যে কারণে এই *অপারেশান রাজারহাট* উপন্যাসের মধ্যে কুরুক্ষেত্রের গল্পটা একটা character এর সূত্রে চলে আসে। সেইরকম ভাবে ভেবেছি। আমার মনে হয়েছে অত্যন্ত ঠিক ভেবেছি। সে-গল্পটা এখানে আছেও। এরকম আরও অনেক কিছুই আছে। তারা ওইরকম ভাবে, খানিকটা পুরাণজীবী লোকও তো এখানে আছে। পুরাণের কথা বলে, পুরাণের কথা ভাবে, সেই অনুযায়ী তাদের কিছু নীতিবোধ আছে। তাদের ধর্মের সঙ্গে পুরাণ জড়িত। একটা গাছকে তারা দেবতা ভাবে। এবার সেটা আমাদের কাছে হয়তো খুবই হাস্যকর মনে হবে যে, একটা নিমগাছকে তারা দেবতা ভাবছে। কি অশিক্ষিত! কি বোকা! খুব অশিক্ষিত, খুব বোকা হতে পারে কিন্তু অন্যকে অভুক্ত রাখার কোনো চক্রান্ত ওই লোকটা করে না যেটা হয়তো আমরা শিক্ষিত লোকরা করি, আমাদের স্বার্থেই। কাজেই কোন্‌টা সভ্যতা। ওইটা সভ্যতা না আমারটা সভ্যতা? সেও তো ভাববার কথা। আমি একবারও বলছি না, যে-অবস্থাটা ছিল সেটা ঠিক ছিল! আদর্শ ছিল। আদর্শ কোনোটাই নয়। কিন্তু এত রকমের জীবনযাপন ছিল তার মধ্যে দিয়ে এটাই যে আদর্শ কে তা বলল? এই নির্ণয় আসলে কার? এটাই যে সত্য কে বলল? আসলে কী হচ্ছে? আসলে আমি একটা একমাত্রিক সভ্যতার দিকে এগোচ্ছি। আমি তো বৈচিত্র্যহীনতাকে প্রশ্রয় দিচ্ছি। আমি তো বহুস্বরকে স্তব্ধ করছি। *অপারেশান রাজারহাট* উপন্যাসাটা হচ্ছে বহুস্বরের এক জীবনযাপন। তার কলধ্বনি। তার রিচ্যুয়াল। তার শোকযাপন। তার স্মরণ। এবার এইটা আমার মনে হয় যে, আমি *বাদার গল্প* থেকে সরাসরি এখানে চলে আসতে পারি। *বাদার গল্প*-য় দক্ষিণ ২৪ পরগণার সুন্দরবন অঞ্চলের কৃষকদের কথা আছে। সেখানেও জমি হারানোর গল্প আছে, অনেক কিছু আছে। আমি চেষ্টা করেছিলাম একরকম ভাবে তেভাগা আন্দোলনের যে কাকদ্বীপ— তাকে পরস্পর সংলগ্ন ম্যানগ্রোভের জড়ানো জটিল শিকড়ের মতোই গুচ্ছ গল্পে পেশ করতে। সেই স্মৃতিটাকেই ওইরকম ভাবে লিখে ফেলার চেষ্টা করেছিলাম। যেখানে ওইরকম উৎখাতের গল্প ছিল, পীড়নের গল্প ছিল, *শৈশবে*ও সেই শরণার্থীর গল্প। যেটা আমার জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত। পূর্ববঙ্গ হচ্ছে আমার পিতৃভূমি, আমার জন্মভূমি নয়। কর্মভূমিও নয়— এবং আমি কোনো দিন যাইওনি পূর্ববঙ্গে। আগেই বলেছি আমার মা এবং অন্যরা যখন সেই পূর্ববঙ্গের কথা বলত, তাদের চোখে জল চলে আসত, গলা ধরে যেত, তখন আমিও তাতে সমান ভাবে কষ্ট পেতাম। এবং শৈশবের সেই হারানো দেশের একটা ঢেউ আছে, আর কিছু নেই, ওই দেশ হারানোর পরের ঢেউ। তো সেইটা দিয়ে শরণার্থীর যাত্রাটা শুরু হয়। খানিকটা *বাদার গল্প*-এও আছে। অন্যের, আত্মীয়ের, মা-মাসির স্মৃতিচারণ, তাঁদের স্মৃতিটা চালান হয়ে গেল আমার মস্তিষ্কে, স্মৃতিতে— এতটাই যেন এ-আমার স্মৃতি। এ ভাবে আশৈশব আমি এক শরণার্থী, এক উদ্বাস্তু— আমার সমস্ত লেখাই এক উদ্বাস্তুরই স্মৃতিচারণা। আর এই *মেধাবীভূত ও মাধবীলতা* হয়ে *অপারেশান রাজারহাট* পর্যন্ত এসে একটা বৃত্ত সম্পূর্ণ হয়।

এবং আমার মনে হয় যে আমার লেখক জীবনেও আমি একটা বৃত্ত সম্পন্ন করতে পেরেছি এই উপন্যাসটা লেখার মধ্যে দিয়ে— এরপর যদি আমি আর না লিখি কোনো ক্ষতি নেই, অন্তত আমার। বরং, এইখানে দাঁড়ি টানলে বাঙালি লেখকদের বহু বহু প্রজ থাকার যে একটা বিদ্‌ঘুটে বাস্তবতা আছে, সেই গণ্ডীর বাইরে যাওয়া যায়, যেতে চাই। □

ফ্রিজের খাবার কত নিরাপদ

স্মরজিৎ জানা

আমরা সবাই আমাদের দৈনন্দিনের অভিজ্ঞতা থেকে জানি যে, শীতকালে খাদ্যদ্রব্য সহজে নষ্ট হয় না— কিন্তু গ্রীষ্মকালে বা গরমের সময় তা দ্রুত খারাপ হয়ে যায়। কয়েক হাজার বছর ধরে মানুষ বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করলেও এর কার্য-কারণ সম্পর্ক মানুষের কাছে খুব একটা সহজবোধ্য বিষয় হিসেবে ধরা দেয় নি— যতদিন না পর্যন্ত মানুষ জীবাণু আবিষ্কার করতে সমর্থ হয়েছে। আজকের দিনে স্কুলের ছাত্ররাও জানে যে, জীবাণু সংক্রমণের কারণে খাদ্যবস্তু দ্রুত নষ্ট হয়ে যায় বা পচে যায়। এবং এ তথ্য আজ বিজ্ঞানের জানা যে, ঠিক কি কি ধরণের জীবাণু খাদ্যদ্রব্যকে কি কি ভাবে এবং কোন্ কোন্ ধরণের খাদ্যদ্রব্যকে কি প্রক্রিয়ায় পরিবর্তিত করে। আবার পাশাপাশি এ-ও আমরা জানি— জীবাণুর সংক্রমণে খাদ্যদ্রব্যের গুণাগুণ পরিবর্তিত হয়ে গেলেই তা 'নষ্ট' হয়ে যায় না, বা খাদ্য হিসেবে গ্রহণের অনুপযুক্ত হয়ে যায় না। উদাহরণ হিসেবে দুধ থেকে দইতে রূপান্তরিত হয়ে যাওয়ার ঘটনাটিকে ধরা যেতে পারে। এক ধরণের জীবাণু (ছত্রাক)-র আক্রমণে দুধ দইতে পরিবর্তিত হয়। কিন্তু তাতে দই খাদ্য হিসেবে গ্রহণের অযোগ্য তো হয়ই না বরং পুষ্টিমূল্য এবং আনুষঙ্গিক গুরুত্ব বেড়ে যায়। আবার, বহুধরণের খাদ্যে জীবাণুর সংক্রমণ শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর।

আমরা যে বিভিন্ন ধরণের খাদ্য খেয়ে থাকি সাধারণ ভাবে সেগুলিকে শর্করা জাতীয়, চর্বি জাতীয় কিংবা প্রোটিন জাতীয় শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। এর অর্থ হলো, ওই সব খাদ্যের প্রধান বা গুরুত্বপূর্ণ অংশ শর্করা, চর্বি বা প্রোটিন হিসেবে উপস্থিত থাকে। চাল, চিনি, গম ইত্যাদি ওই কারণে শর্করা জাতীয় খাদ্য, কিংবা মাছ, মাংস, প্রোটিন শ্রেণির খাদ্য হিসেবে স্বীকৃত। প্রকৃতিতে বহু ধরণের জীবাণু রয়েছে, যেগুলি শর্করা জাতীয় খাদ্যের ভিতর দ্রুত বংশবৃদ্ধি করতে পারে। অনুরূপে বহু ধরণের জীবাণু আবার প্রোটিনের ওপর দ্রুত বিক্রিয়া ঘটায়। তবে সাধারণ ভাবে বলা চলে প্রায় সব ধরণের জীবাণু যেগুলি খাদ্যে বংশবৃদ্ধি করে সেইসব জীবাণুর বংশবৃদ্ধির জন্য খাদ্যবস্তুর মধ্যেকার তাপমাত্রার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সাধারণত ২০ ডিগ্রি থেকে ৩০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড— জীবাণুদের বংশবৃদ্ধির সহায়ক তাপমাত্রা। তাপমাত্রা এর বেশি বা কম হলে জীবাণুর বংশবৃদ্ধিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। এছাড়া খাদ্যবস্তুর অম্লতাও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অম্লতা বাড়লে অর্থাৎ বস্তুটি বেশি অ্যাসিডিক হলে কিংবা খুব ক্ষারীয় হলেও জীবাণুর বংশবৃদ্ধি প্রতিহত হয়। এও আমাদের সকলেরই অভিজ্ঞতা যে, টক জাতীয় খাদ্যদ্রব্য তাড়াতাড়ি নষ্ট হয় না। আরও একটি অভিজ্ঞতা প্রায় সকলেরই রয়েছে তা হলো জলীয় খাদ্যবস্তু শুকনো খাদ্যের তুলনায় দ্রুত খারাপ হয়ে যায়। অর্থাৎ জীবাণুর বংশবৃদ্ধির জন্য পরিমিত তাপমাত্রা, পরিমিত অম্লতা ও জলীয় পদার্থের উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন।

জীববিজ্ঞানের এই জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে খাদ্যে ক্ষতিকারক জীবাণুর সংক্রমণ আমরা খুব সহজেই এড়িয়ে যেতে পারি। তাপমাত্রা ছাড়া অন্য দু'টি বিষয়ে আমাদের বিশেষ কিছু করণীয় নেই। কারণ খাদ্যের স্বাদ, আকার, আকৃতি ইত্যাদি রাতারাতি পাল্টে ফেলতে পারি না। আবার আমরা সব খাবারকে অম্ল বা টক জাতীয় খাদ্যে পরিবর্তিত করতেও পারি না, কিংবা খেতে গেলে শুকনো খাবারই শুধু খেতে হবে— এমন ব্যবস্থাও করতে পারি না, কারণ এতে মানুষের রুচি, স্বাদ বোধ তথা খাদ্য সংস্কৃতির বিষয়ও ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। তাই খাদ্যবস্তু, বিশেষত রান্না করা খাদ্যের তাপমাত্রার বিষয়টি যদি খেয়াল রাখা হয়, তাহলে খাদ্যের মাধ্যমে ক্ষতিকারক জীবাণুর আক্রমণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রোধ করা সম্ভব হবে।

বিজ্ঞানের এই তথ্যের ওপর ভিত্তি করে রেফ্রিজারেটর 'ফ্রিজ' বা ওই জাতীয় প্রযুক্তির উদ্ভাবন তথা ব্যবহার— খাদ্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে বর্তমান বিশ্বে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছে। শুধু রান্না করা খাদ্যবস্তু নয়, কাঁচা শাকসব্জি মাংস ইত্যাদি আজ কোল্ডস্টোরেজে বহুদিন পর্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় রেখে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। এক ঋতুতে উৎপন্ন খাদ্যসামগ্রী আজ অন্য ঋতুতে ব্যবহার করায় কোনো অসুবিধাই নেই। অতিরিক্ত পরিমাণ খাদ্য ভবিষ্যতের জন্য জমিয়ে রাখাও সম্ভব হয়েছে এই প্রযুক্তির কল্যাণে।

ফ্রিজ-এর ব্যবহার একালের মধ্যবিত্ত উচ্চবিত্ত পরিবারে প্রায় অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। এর ফলে একবার রান্না করে সে-খাবার কয়েকদিন নির্ভাবনায় খাওয়া যেতে পারে, প্রতিবেলা হাত পুড়িয়ে রান্না করার প্রয়োজন পড়ে না। অবশ্য এটা ঠিক, এই প্রযুক্তি করায়ত্ত হলেও এদেশে এখনও বিরাট সংখ্যক সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরেই তা থেকে গেছে— মূলত অর্থনৈতিক কারণে। তবে বিকল্প প্রযুক্তিও আবিষ্কৃত হয়েছে, অনেক সস্তায় তা ব্যবহার করা যায়, কিংবা ঘরেই তা তৈরি করে নেওয়া যায়। এ ব্যাপারে সামান্য কিছু অভিজ্ঞতা ও উৎসাহ থাকলেই তা সম্ভব। কারণ খাদ্য সংরক্ষণের মূল নীতিটি হলো ওই তাপমাত্রার বিষয়টি। খাদ্যবস্তুতে জীবাণু সংক্রমণ পুরোপুরি রোধ করতে, নিরাপত্তা সম্পূর্ণ ভাবে নিশ্চিত করার তাগিদে বিজ্ঞানীরা কোনো ধরণের ঝুঁকি নিতে নারাজ। তারা বলছেন, যদি খাদ্যবস্তুকে দশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের নীচে অথবা ষাট ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের ওপর রাখা যায়, তবে তা নিশ্চিন্তে আহার করা চলে। বিকল্প প্রযুক্তিতে এতটা নির্ভরতা না পাওয়া গেলেও, কাজ চালিয়ে দেওয়া যায়। যদি পাশাপাশি আরও কিছু সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। এই

এরপর ১১ পাতায় ➔

জলাতঙ্ক : যে রোগে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী

পুণ্যব্রত গুণ

ছোটোবেলায় আমি আর ভাই বাবা-মার সঙ্গে বিয়েবাড়িতে গিয়েছিলাম ব্যারাকপুরে। ভাইকে কুকুরে কামড়ায়, পাগল কিনা জানা নেই। তারপর পর পর ১৪ দিন মা ভাইকে পাস্তুর ইন্সটিটিউটে নিয়ে যেত পেটে জলাতঙ্কর টিকা লাগাতে। প্রচণ্ড কষ্টকর সেই টিকা—ভাইয়ের জলাতঙ্ক হয়নি।

আজ থেকে বছর কুড়ি আগে জলাতঙ্ক নিয়ে আমার প্রথম জনশিক্ষামূলক লেখা। লেখাটা শুরু করেছিলাম একটি সত্যি ঘটনা দিয়ে। ছত্তীসগঢের দল্লী-রাজহরার ছোট্ট মেয়ে সুরেখা— বাবা লোহা-খাদানের ট্রাক-ড্রাইভার, মারা গেছেন আগে, মা খনির ঠিকা-শ্রমিক। পাগলা কুকুর কামড়ানোর পর সরকারি হাসপাতালে সময়মতো টিকা পাওয়া যায়নি। দেড় মাসের বেশি সময় পরে তাকে ১৪টা টিকা লাগানো হয়। আড়াই মাসের মাথায় জলাতঙ্ক-আক্রান্ত হয়ে মারা যায় সে।

আগের টিকা এখন নিষিদ্ধ হয়ে গেছে— এখন ৫টা ৬টা টিকার কোর্স। সরকারি হাসপাতালে বিনামূল্যে টিকা পাওয়ার কথা, অনেক সময়ই পাওয়া যায় না। তাই হাওড়া জেলার চেঙ্গাইলে শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ওষুধের দোকানে আমরা স্টক করি সরকারি টিকা-প্রস্তুতকারী কোম্পানি ইন্ডিয়ান ইমিউনোলজিকাল লিমিটেড-এর জলাতঙ্ক-র টিকা— Abhayrab, বাজারে একটা মাত্রার দাম ৩৪০ টাকা, আমরা কিনি ২০৬.১৮ টাকায়, বিক্রি করি ২১০ টাকায়। সেই দামেও কিনতে পারেন না বেশির ভাগ রোগী।

জলাতঙ্কে আক্রান্ত হলে মৃত্যুর সম্ভাবনা প্রায় একশোভাগ। এখনও অবধি জলাতঙ্কে আক্রান্ত মাত্র ৪ জনকে বাঁচানো গেছে— তাও নিবিড় জীবনরক্ষা ব্যবস্থা এবং অত্যুত্তম সেবা-যত্ন দিয়ে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ২০০৫-এর হিসেব অনুযায়ী প্রতি বছর সারা দুনিয়ায় প্রায় ৫০,০০০ মানুষ জলাতঙ্কে মারা যান— এঁদের মধ্যে ২০,০০০ ভারতবাসী। আধুনিক টিকা ও সিরাম দিয়ে চিকিৎসায় জলাতঙ্ক এখনও কিন্তু প্রতিরোধ-যোগ্য। ডাক্তার যদি ঠিকঠাক চিকিৎসা না করেন, তাহলে ক্রেতা সুরক্ষা আইনের কবলে পড়তে পারেন তিনি।

কিভাবে রোগ ছড়ায়

১. কামড়; ২. আঁচড়; ৩. চাটা; ৩. জলাতঙ্কে আক্রান্ত গোরু বা মোষের কাঁচা দুধ খাওয়া।

কিসে কতটা ঝুঁকি

ঝুঁকি নেই : ১. পশুকে ছোঁয়া, খাওয়ানো, অক্ষত চামড়ায় পশুর চাটা।

মাঝারি ঝুঁকি : ১. অল্প আঁচড়ানো বা ছেড়ে যাওয়া, যাতে রক্তপাত হয়নি। ২. ক্ষত চামড়ায় চাটা।

খুব ঝুঁকি : ১. ক্ষত থেকে রক্ত পড়ছে। ২. শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে চাটা। ৩. জলাতঙ্কে আক্রান্ত পশুর কাঁচা দুধ খাওয়া।

রোগ-সংক্রমণ

যে জীবাণু থেকে জলাতঙ্ক রোগ হয়, তা এক ছোট্ট ভাইরাস— আকৃতি বুলেটের মতো, এত ছোটো যে কেবল ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের নীচেই দেখা যায়। জলাতঙ্কে আক্রান্ত পশুর লালায়, জলাতঙ্ক রোগীর লালায় ও প্রস্রাবে ভাইরাস থাকে। কামড়, আঁচড় এবং ক্ষত চামড়া ও অক্ষত শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে চাটায় ভাইরাস শরীরে ঢোকে। প্রথমে স্থানীয় কোষ-কলা ও মাংসপেশীতে বংশবৃদ্ধি করে, তারপর একটা স্নায়ুতে ঢোকে। স্নায়ু দিয়ে বেশ দ্রুত গতিতে ভাইরাস যায় মস্তিষ্কে। মস্তিষ্ক আক্রান্ত হলে শুরু হয় জলাতঙ্ক , বাতাসে আতঙ্ক, আলোয় আতঙ্ক। শেষ মৃত্যুতে।

শরীরে ভাইরাস প্রবেশ ও জলাতঙ্ক-র লক্ষণ দেখা দেওয়ার মধ্যে সাধারণত ৩ সপ্তাহ থেকে ৩ মাস সময় লাগে। তবে ৪ দিনের মধ্যেও রোগ দেখা দিতে পারে, আবার ২ বছরও সময় লাগতে পারে।

কোন্ পশু থেকে জলাতঙ্ক?

এ-দেশে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে রোগ সংক্রামিত হয় কুকুর আর বেড়ালের মাধ্যমে (৯৮ শতাংশ)। কখনও হতে পারে বাঁদর, গাধা, ঘোড়া, গোরু, মোষ, ছাগল, ভেড়া ও শূয়োরের মাধ্যমে (১ শতাংশ)। কখনও নেউল, শেয়ালের মতো জংলী জানোয়ার, উট আর হাতির মাধ্যমেও হতে পারে (১ শতাংশ)। তবে সাধারণত খরগোস, ইঁদুর, ছুঁচো, কাঠবিড়ালি, পাখি ও বাদুড়ের মাধ্যমে জলাতঙ্ক হতে দেখা যায় না।

মানুষের জলাতঙ্ক-র উপসর্গ-লক্ষণ

দু'ধরনের জলাতঙ্ক দেখা যায়— প্রায় ৮০ শতাংশ ক্ষেত্রে রোগীর উন্মত্তের মতো উপসর্গ-লক্ষণ দেখা যায়, ২০ শতাংশ ক্ষেত্রে পক্ষাঘাতের মতো।

১. শুরুতে গা-ম্যাজম্যাজ করা, জ্বর, মাথাব্যথা হয়। ২. ক্ষতের জায়গায় ব্যথা, থেকে থেকে চারপাশের মাংসপেশীতে খিঁচ ধরা, ঝিনঝিনি হয়। ৩. ক্রমশ শরীরের সমস্ত মাংসপেশীতে টান ধরে বা দীর্ঘ সময় যন্ত্রণাদায়ক ভাবে খিঁচ ধরে। গলার মাংসপেশীতে খিঁচ ধরার ফলে রোগী জল বা খাবার গিলতে পারেন না। এরপর জল দেখলেই গলার মাংসপেশীতে ওই রকম ব্যথা ও যন্ত্রণাদায়ক খিঁচ ধরে। তা থেকেই রোগের নাম— জলাতঙ্ক (ইংরেজিতে Hydrophobia, hydro মানে জল, phobia মানে ভয় বা আতঙ্ক)। এছাড়া উদ্বেগ, বিভ্রান্তিও হয়। শ্বাসনালীর মাংসপেশীতে খিঁচ ধরার জন্য শ্বাসকষ্ট ও বাতাসে আতঙ্ক হয়। আলোতে আতঙ্ক হয়। ঘুম আসে না। ৪. শেষে রোগী অচেতন হয়ে পড়ে ও মৃত্যু হয়।

কামড়ানোর পরের চিকিৎসা

কামড়ের পরের চিকিৎসা লক্ষ্য হলো কামড়ানোর জায়গা থেকে জলাতঙ্কের ভাইরাসকে দূর করা যাতে ওই ভাইরাস স্নায়ুকোষে পৌঁছোতে না পারে। এর থেকেও বেশি জরুরি হলো ওই ব্যক্তিকে জলাতঙ্কের টিকা দেওয়া। সেল্ কালচার টিকা (cell culture vaccine) দিতে পারলে ভালো।

জলাতঙ্কের চিকিৎসার তিনটে অঙ্গ হলো ১. কামড়ের জায়গায় ঘায়ের চিকিৎসা। ২. পশুটাকে নজরে রাখা। ৩. জলাতঙ্কের টিকা দেওয়া।

১. কামড়ের জায়গায় ঘায়ের চিকিৎসা

কুকুরের কামড়ের ঘাকে ভালো ভাবে সাবান ও জল দিয়ে ধোয়া উচিত। আরও ভালো হয় কামড়ের জায়গাটাকে কলের জলের নীচে রেখে ধুলে। কার্বলিক অ্যাসিড দিয়ে ঘায়ের জায়গাকে পোড়ানোর চেষ্টা করা ক্ষতিকর। গভীর ঘা হলে— ধুলো ময়লা বার করে, দরকারে ঘায়ের জায়গার মরা চামড়া কেটে বাদ দিয়ে ভালো ভাবে পরিষ্কার করতে হবে। সাধারণ ভাবে ওই কাটা জায়গা সেলাই করা নিষিদ্ধ। যদি করতেই হয় তাহলে ঘায়ের চারপাশে জলাতঙ্ক-র ইমিউনোগ্লোবিউলিন ইঞ্জেকশন অবশ্যই দিতে হবে। সাধারণত জন্তুর কামড়ের ঘা ড্রেসিং বা ব্যান্ডেজ করা হয় না। টিটেনাস যাতে না হয় তার জন্য টিটেনাস টক্সয়েড এবং দরকারে টিটেনাস ইমিউনোগ্লোবিউলিন ইঞ্জেকশন দিতে হবে। এই চিকিৎসাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শুরু করতে হবে।

২. পশুটাকে নজরে রাখা

যে পশুটা কামড়েছে, সম্ভব হলে, তার জলাতঙ্কের লক্ষণ (আগে বলা হয়েছে) দেখা দিচ্ছে কিনা সেটা ১০ দিন ধরে নজর রাখতে হবে। ১০ দিন নজর রাখার কারণ হল— পশুটার শরীরে জলাতঙ্ক-র ভাইরাস থাকলে জলাতঙ্ক-র লক্ষণ ফুটে ওঠার ৫ দিন আগে অবধি তার লালা থেকে সংক্রমণ হতে পারে। আর একবার জলাতঙ্ক-র লক্ষণ দেখা দেওয়ার পর পশুটা আরও ৫ দিনের মধ্যে নিশ্চিত ভাবেই মারা যায়।

৩. জলাতঙ্কের টিকা দেওয়া

যে পশুটা কামড়েছে তার গোড়া থেকেই জলাতঙ্ক-র লক্ষণ থাকলে কিংবা লক্ষণ দেখা দিলে অথবা সে ১০ দিনের মধ্যে মারা গেলে বা তাকে খুঁজে পাওয়া না গেলে, সঙ্গে সঙ্গে জলাতঙ্কের টিকা শুরু করে দেওয়া উচিত।

জলাতঙ্কের টিকা

কোষ থেকে তৈরি টিকা : এই টিকা আবার দু'রকম হতে পারে। ক. মানুষের ডিপ্লয়েড কোষে তৈরি টিকা (Human Diploid Cell বা HDC)। খ. জীবজন্তুর কোষ থেকে তৈরি টিকা (Animal tissue culture vaccine)। কোন্ জন্তুর কোষ থেকে তৈরি হয়েছে তার ওপর নির্ভর করে এদের আবার কয়েক ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন— ১. মুরগির ভ্রূণের কোষ ব্যবহার করে তৈরি বিশুদ্ধ টিকা(Purified chick embryo cell বা PCEC vaccine)। ২. বিশুদ্ধ ভেরো কোষে তৈরি জলাতঙ্ক-র টিকা (Purified Vero cell Rabies vaccine বা PVRV)। ৩. হাঁসের ভ্রূণের কোষে তৈরি জলাতঙ্কের টিকা (Duck embryo vaccine বা DEV)। ৪. স্নায়ুকোষ-কলাতে তৈরি টিকা (Nervous tissue vaccine বা NTV) অর্থাৎ প্রাপ্তবয়স্ক প্রাণীর (যেমন ভেড়ার) মস্তিষ্ক থেকে তৈরি টিকা। একে সেম্পেল টিকাও (Semple Type) বলা হয়।

কামড়ের ধরণের অর্থাৎ কি পরিমাণ ভাইরাস আপাত ভাবে ঢুকেছে তার গুরুত্বের ওপর টিকা দেওয়ার ব্যাপারটা নির্ভর করে। এ বিষয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশিকা আছে। (পরের পাতায় দেখুন।)

জলাতঙ্কের টিকা কিভাবে দিতে হবে

জলাতঙ্কের টিকা কিভাবে দিতে হবে, তার জন্যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সুপারিশ আছে। সেই অনুযায়ী মোট ৬টা ডোজ। ১ মিলি করে কামড়ের দিন, ৩য়, ৭ম, ১৪তম ও ৩০তম (বা ২৮তম) দিনে এবং বুস্টার ডোজ ৯০ দিনে দিতে হবে।

কোথায় টিকা দেওয়া হবে?

বাহুর ডেল্টয়েড এলাকার (deltoid region) মাংসপেশীতে ইঞ্জেকশন দিতে হবে। শিশুদের জংঘার সামনে বাইরের দিকের (anterolateral area) মাংসপেশীতেও টিকা দেওয়া যায়। পাছায় এই টিকা দেওয়া উচিত নয়, কেননা পাছার চামড়ার নীচে জমে থাকা চর্বি ভেদ করে টিকার ওষুধ রক্তে পৌঁছে কাজ হতে দেরি হতে পারে বা কাজ না-ও হতে পারে।

আগে কখনও কামড়ানোর আগে বা পরে সেল কালচার টিকা দেওয়া হয়ে থাকলে কামড়ের দিন এবং ৩য় দিনে মোট দুটো ইঞ্জেকশন দিলেই কাজ হবে। কামড় গুরুতর হলে (শ্রেণি ৩) ৭ম দিনে আরেকটা ডোজ ইঞ্জেকশন দিতে হবে।

এছাড়া শ্রেণি ৩-এর ক্ষেত্রে কামড়ের দিনে জলাতঙ্কের ইমিউনোগ্লোবিউলিন (Rabies immunoglobulin বা RIG) ইঞ্জেকশন দিতে হবে।

জলাতঙ্ক প্রতিরোধে ইমিউনোগ্লোবিউলিন ইঞ্জেকশন হয় দু'ধরণের। ১. ঘোড়ার শরীরে তৈরি জলাতঙ্কের ইমিউনোগ্লোবিউলিন (Equine Rabies Immunoglobulin বা ERIG)। এটা ঘোড়ার রক্তরস (Plasma) থেকে তৈরি হয়। ২. মানুষের শরীরে তৈরি জলাতঙ্কের ইমিউনো-গ্লোবিউলিন (Human Rabies Immunoglobulin বা HRIG) মানুষের রক্তরস (Plasma) থেকে তৈরি হয়। ERIG ব্যবহারে অ্যালার্জি হবার ঝুঁকি বেশি, তাই HRIG-কেই বেশি পছন্দ করা উচিত, কিন্তু এর দাম বেশি।

টিকা দেবার পর শরীরে জলাতঙ্কের ভাইরাসকে নির্জীব করে দেওয়ার মতো পর্যাপ্ত অ্যান্টিবডি তৈরি হতে ১০ থেকে ১৪ দিন সময় লাগে। এই সময়ে জলাতঙ্কের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ শক্তি জোগায় জলাতঙ্ক প্রতিরোধকারী এই ইমিউনোগ্লোবিউলিন ইঞ্জেকশন। টিকার প্রথম ডোজের সঙ্গে ২০ আই. ইউ প্রতি কেজি হিসাবে HRIG মাংসপেশীতে দিতে হয়। মোট মাত্রার (dose-এর) কিছুটা ঘায়ের চারপাশে ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়, বাকিটা মাংস-পেশীতে ইঞ্জেকশন করা হয়। এটা দেওয়ার পর ইঞ্জেকশনের জায়গায় ব্যথা এবং অল্প জ্বর ছাড়া অন্য প্রতিক্রিয়া হবার কথা নয়। ERIG একই ভাবে দেওয়া হয়, তবে মাত্রা প্রতি কেজি ওজনের জন্য ৪০ আই. ইউ (আন্তর্জাতিক একক)।

সংস্পর্শের বা কামড়ের পরে টিকা দেবার সময়

কোষ থেকে তৈরি টিকা দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রধানত তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করে নেওয়া হয়। শ্রেণি ১ : ঠিকমতো ইতিহাস পাওয়া গেলে চিকিৎসার দরকার নেই। শ্রেণি ২ : ক. যাঁদের আগে কোনোদিন এই টিকা দেওয়া নেই তাঁদের ক্ষেত্রে কামড়ের দিন এবং তারপর ৩য়, ৭ম,১৪তম, ৩০তম ও ৯০ দিনের দিন জলাতঙ্কের টিকা দিতে হবে। খ. যাঁদের আগে এই টিকা দেওয়া আছে তাঁদের কামড়ের দিন এবং ৩য় দিনে জলাতঙ্কের টিকা দিতে হবে। এবং শ্রেণি ৩ : ক. যাঁদের আগে জলাতঙ্কের টিকা দেওয়া নেই

তাঁদের এই টিকা দিতে হবে। কামড়ের দিনে (এবং সাথে সাথে আলাদা ভাবে ইমিউনোগ্লোবিউলিন ইঞ্জেকশন মাত্র এক বার) তারপর ৩য়, ৭ম, ১৪তম, ৩০তম ও ৯০ দিনের মাথায় কেবল জলাতঙ্কের টীকা দিতে হবে। খ. যাঁদের আগে জলাতঙ্কের টিকা দেওয়া আছে তাঁদের এই দিতে হবে কামড়ের দিনে, ৩য়, ও ৭ম দিনে।

জলাতঙ্কের টিকা

চামড়ার মধ্যে ইঞ্জেকশন দেওয়া

কোষ থেকে তৈরি জলাতঙ্কের টিকা নিঃসন্দেহে অনেক বেশি কার্যকর। অন্যদিকে কামড়ের দিন থেকেই যদি সেম্পেল টিকা দেওয়া শুরু করা হয় তাহলেও মাত্র শতকরা ৬০-৭০ ভাগ ক্ষেত্রে টিকায় কাজ হয়। সেম্পেল টিকা দিলে ৭ দিনের মধ্যে শতকরা ২ জনের শরীরে ভাইরাস প্রতিরোধ করার মতো অ্যান্টিবডি তৈরি হয়। মানুষের কোষ থেকে তৈরি জলাতঙ্কের টিকা (HDC) ব্যবহার করলে ওই সময়ের মধ্যে শতকরা ৮৮ জনের শরীরে প্রতিরোধ করার মতো অ্যান্টিবডি তৈরি হয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো— এই টিকা অনেক নিরাপদ।

সেম্পেল টিকা ব্যবহারে প্রতি হাজার জনের মধ্যে একজন থেকে প্রতি দশ হাজার জনের মধ্যে একজনের অ্যালার্জি-জনিত এক ধরণের এনকেফালোমায়েলাইটিস হতে পারে। HDC টিকা ব্যবহারে এই বিপদ নেই।

মুরগির ভ্রূণ কোষ থেকে তৈরি টিকার দাম HDC টিকার অর্ধেকেরও কম কিন্তু HDC টিকার মতোই কার্যকর। এছাড়া HDC টিকার বুস্টার ডোজ দেবার পর যে ধরণের অ্যালার্জি-জনিত পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা যায় তাও PCEC টিকায় হয় না। যদিও এক মিলি PCEC টিকার দাম এক মিলি সেম্পেল টিকার চেয়ে অনেক বেশি কিন্তু গবেষণায় দেখা গেছে কম পরিমাণে (মাত্রা এক মিলি-র দশ ভাগের এক ভাগ) চামড়ার মধ্যে ইঞ্জেকশন করে দেওয়া হলে যে উপকার হয় সেটা মাংসপেশীতে ইঞ্জেকশন করে টিকা (মাত্রা এক মিলি) দেবার সমান।

১৯৯২-র বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সুপারিশ করেছে যে কোষ থেকে তৈরি মোট ০.৮ মিলি টিকা এ ভাবে দিতে হবে— ০ (অর্থাৎ প্রথম) দিন। তারপর ৩য় এবং ৭ম দিনে দুটো জায়গায় ০.১ মিলি করে দুটো টিকা এবং ৩০ এবং ৯০ দিনে একটা জায়গায় ০.১ মিলি করে একটা টিকা।

নৈতিক প্রশ্ন ও বাস্তব সমস্যা

সেম্পেল টিকায় বেশ ব্যথা হয়, পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া বেশি এবং এনকেফালাইটিসের ঝুঁকি থাকে এবং এতে মৃত্যুও হতে পারে। আমাদের দেশে বছরে প্রায় ৬০০ জন জলাতঙ্কের টিকা দেবার পর টিকার জন্য এনকেফালাইটিসে ভোগেন। কোষ থেকে তৈরি টিকা চামড়ার মধ্যে ইঞ্জেকশন দেবার কার্যকারিতা প্রমাণিত হওয়ার পর এবং তাঁর দাম কম হওয়া সত্ত্বেও সেম্পেল টিকা দেওয়া অবশ্যই অনৈতিক কাজ। এছাড়া সেম্পেল টিকা বানাতে হাজার হাজার ভেড়াকে মারতে হয়। কোষ থেকে তৈরি টিকা চামড়ার মধ্যে ইঞ্জেকশন দেবার কার্যকারিতা প্রমাণিত হওয়ার পর এত বিপুল সংখ্যক প্রাণী হত্যাও অনৈতিক।

যে সব ওষুধ কোম্পানি ভারতে PCEC ও PVR টিকা তৈরি করে, তারা চামড়ার মধ্যে টিকা দেবার কথা বলে না বা ০.১ মিলি অ্যাম্পুলে ওই সব টিকা বিক্রিও করে না, কেন না তাতে তাদের বিক্রির এবং লাভের মোট পরিমাণ কমে যাবে। পশ্চিমের দেশগুলোতে কিন্তু কোষ থেকে তৈরি টিকা চামড়ায় ইঞ্জেকশন দেবার জন্য ০.১ মিলি অ্যাম্পুলে পাওয়া যায়। আমাদের দেশের টিকা প্রস্তুতকারীদেরও এটা তৈরি করতে বাধ্য করা উচিত।

জলাতঙ্কের টিকা কখন দিতে হবে সে-সম্বন্ধে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশিকা

শ্রেণি	সংস্পর্শের ধরণ সন্দেহজনক কিংবা নিশ্চিত জলাতঙ্কগ্রস্ত পালিত বা বন্যপশু[১] যাকে নজরে রাখা যাচ্ছে না।	চিকিৎসা যে ভাবে হওয়া উচিত
১.	পশুটাকে নিয়ে খেলা করার বা খাওয়ানোর সময় অক্ষত চামড়ায় পশুর চাটা।	১. ঠিক মতো ইতিহাস পাওয়া গেলে চিকিৎসার দরকার নেই।
২ক.	রক্তপাত ছাড়া অল্প আঁচড়।	২ক. সঙ্গে সঙ্গে টিকা দেওয়া শুরু করুন।[২]
২খ.	ক্ষত আছে এমন চামড়ায় চাটা।	২খ প্রাণীটা ১০ দিন সুস্থ থাকলে চিকিৎসা বন্ধ করা যায় বা ল্যাবরেটরি পরীক্ষায় যদি প্রমাণিত হয় যে প্রাণীটার জলাতঙ্ক নেই, তাহলে এই টিকা নেওয়া বন্ধ করে দেওয়া যায়।
৩ক.	এক বা একাধিক কামড় বা আঁচড় যা চামড়া ভেদ করেছে।	৩ক সঙ্গে সঙ্গে জলাতঙ্কের টীকা ও ইমিউনোগ্লোবিউলিন ইঞ্জেকশন দেবার ব্যবস্থা করতে হবে[২]।
৩খ.	শ্লেষ্মাঝিল্লীতে পশুটার লালার ছোঁয়া লেগেছে।	৩খ ১০ দিন[৩] পশুটা সুস্থ থাকলে চিকিৎসা বন্ধ করা যায় বা ল্যাবরেটরি পরীক্ষায় যদি দেখা যায় পশুটার জলাতঙ্ক নেই তাহলেও চিকিৎসা বন্ধ করা যায়।

১. ইঁদুর, ছুঁচো ও খরগোশের কামড়ের জন্য খুব কম ক্ষেত্রেই জলাতঙ্করোধী চিকিৎসা লাগে।

২. যে এলাকায় জলাতঙ্ক কম হয় (low-risk area) সেখানকার আপাত সুস্থ কুকুর বা বেড়ালকে নজরে রাখা গেলে, চিকিৎসা শুরু করতে দেরি করা যায়।

৩. নজর রাখার এই সময় কেবল কুকুর ও বেড়ালের জন্য প্রযোজ্য। সংকটাপন্ন বিরল প্রজাতির প্রাণী ছাড়া, অন্য সব গৃহপালিত বা বন্য প্রাণীর জলাতঙ্ক সন্দেহ হলে তাদের মানবিক ভাবে হত্যা করে, উপযুক্ত ল্যাবরেটরি পদ্ধতিতে পরীক্ষা করা উচিত।

এই নির্দেশিকা বিশেষ কিছু পরিস্থিতিতে পরিবর্তন করা যায়। যদিও সংস্পর্শের বা কামড়ের সঙ্গে সঙ্গে বা যথা সম্ভব তাড়াতাড়ি টিকা দেবার কথা বলা হয়েছে, তবুও কেউ দেরি করে এলেও, যত দেরিই হোক তাঁকে টিকা দেওয়া উচিত।

উচ্ছেদ আখ্যান : রাজারহাট

অভিজিৎ গুহ

অপারেশন রাজারহাট আসলে একটি স্মার্ট সামাজিক রাজনৈতিক দলিল। অবশ্যই সাম্প্রতিক এবং একই সঙ্গে ঐতিহাসিকও। হ্যাঁ গল্প একটা আছে বটে। গপ্পো ছাড়া উপন্যাস হয় কি করে? সমস্যা হলো, আজকের এই বিশ্বায়িত দুনিয়ায় যাঁরা এই জমি ডাকাতি নিয়ে সিরিয়াস গবেষণা করেন এবং করে চলেছেন তাঁদের একটা বেশ বড়ো অংশ অবাঙালি, বাংলা জানেন না। অথচ স্বাধীনতার পর থেকে স্বাধীন সরকারগুলো, ঔপনিবেশিক আইন ও লাঠি-বন্দুক, গুণ্ডা, পাইক বরকন্দাজ সহযোগে দুই বিঘা জমির উপেনদের কিভাবে উচ্ছেদ ও নির্মূল করে চলেছে, সঙ্গে চলছে রাজনীতির লোকজনদের প্রকাশ্য নির্লজ্জতার মিছিল, এ সবের চমৎকার সব বর্ণনা বহুকাল যাবৎ ঔপনিবেশিক ভাষায় বাজারে পাওয়া যায়। পড়ে কজন? এখানেই পশ্চিমবঙ্গের কথা আসে। এ এক অদ্ভুত রাজ্য বটে (রাঘব হলে বলতেন রাজ্যি); কারণ এ রাজ্যেই তেভাগা আন্দোলন হয়, নকশালবাড়ি হয়, ভূমি সংস্কার, অপারেশন বর্গা হয়। নাক-উঁচু, মাঝারি এবং দীন দরিদ্র গবেষকরা ওসব নিয়ে পণ্ডিতি লেখা ছাপান অথচ নাকের ডগায় উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের নামে ঔপনিবেশিক আইনের চেয়েও অত্যাচারী আইন ১৯৪৮ থেকে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত টিঁকে থাকে, গ্রামে-গঞ্জে জমি অধিগ্রহণ হয়ে যায়, বিধানসভা নামক লঙ্কায় ক্রমাগত এক রাবণের বদলে পরবর্তী রাবণের দল আসে যায়, বিরোধী বেঞ্চিতে বসে জমি অধিগ্রহণের বিরোধিতা করে, জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়ে কয়েক বছর বাদে আবার সেই বাবু বিবিরাই সরকার পক্ষে গদি আঁটা চেয়ারে বসে ঔপনিবেশিক আইনের চেয়ে নোংরা West Bengal Land (Requisition and Acquisition) Act 1948 আরও কিছুদিনের জন্য চালু রাখার সপক্ষে জোরদার সওয়াল করেন। এসব জানে কজন? পশ্চিমবঙ্গ সত্যিই আশ্চর্য রাজ্য! ভাগ্যিস দ্য গ্রেট আলেকজান্ডার বঙ্গদেশে ঢোকেন নি! তাহলে সেলুকাসকে আঙুল তুলে আমাদের রাজ্যের দিকেই দেখাতেন। না, এসব কথা রাঘবের পুঁথিতে নেই কিন্তু ওই মহাভারতটি পড়ার আগে অথবা পরে যে কোনো আগ্রহী পাঠক-পাঠিকা জেনে নিতে পারেন। তাহলে বুঝতে পারবেন কি ধরণের রাজ্যে, কি ধরণের ভণ্ডামি নিয়ে রাঘব তাঁর গপ্পো ফেঁদেছেন। ঢুকে পড়া যাক গপ্পোর মধ্যে।

জমি, জলাভূমি,গাছপালা আর অনেকগুলি গ্রাম নিয়ে শহর কলকাতার উত্তর-পূর্ব দিক জুড়ে যে বিশাল অঞ্চল তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে কর্পোরেট লোভ। চলছে জমি ডাকাতি। নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে কৃষি সমাজ, কৃষকের মৃত্যু না ঘটলে নাগরিক সমাজের জন্ম হবে কি করে? বইটির প্রথম অধ্যায় (পাখি কখন উড়ে যায়)-এ রাঘব প্রশ্ন এবং উত্তরও দিয়ে দেন :

> 'স্বপ্নের রাজার হাট কার মগজে মটকা মেরে শুয়েছিল?
>
> এর কোনো হদিশ নেই।
>
> থাকার কথাও নয়; কারণ বিজ্ঞ পাঠক জানেন, তা-ও একটা নয় বহু। এই বহুর মাঝে একা কে বীণা বাজায়, কে গেঁথেছে ভুবন জোড়া এই মালা, এত জানতে চেও না; জানার ধৃষ্টতা, এই রাক্ষুসে খিদে সর্বনাশ ঘটাতে পারে, খসে পড়তে পারে আমাদের জিভ ও কান, এমনকী সবের ধন নীলমণি নামের মুণ্ডুটিও। (পৃ. ২৫।)

জমি অধিগ্রহণ (এটা পোশাকি, আইনি নাম) আসলে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা তথা সন্ত্রাসের মাধ্যমে জনস্বার্থের নামে খাদ্যে স্বনির্ভর, প্রকৃতির উপর অনেকটাই নির্ভরশীল কৃষক-সমাজকে নির্মূল করে দেওয়াটা ঐতিহাসিক ও বিশ্বায়িত ঘটনা। এই ব্যাপক ঘটনার কথা এরিক হবসবম তাঁর কৃষকের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে দেখেছেন। আরও আগে দেখেছেন অর্থনীতিবিদ গুনার মিরদাল তার *Asian Drama* গ্রন্থে। রাঘব গপ্পোকারের ঢঙে ওই মহাকাব্যগুলির মতো স্থানীয় লোকগাথার কায়দায় কমলকুমার স্টাইলে, শ্লেষ ব্যঙ্গ অথচ অসম্ভব এক মানবিক ঢঙে রক্তমাংসের মানুষদের বর্ণনা দিয়েছেন *অপারেশন রাজারহাট* উপন্যাসে। যেহেতু উপন্যাসটি প্রায় গবেষণামূলক দলিল তাই সঙ্গত কারণেই গল্পের মধ্যেই চলে আসে বহু তথ্য। সরকারি নোটিশ, পঞ্চায়েতের জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত (যা শেষ পর্যন্ত ধোপে টেঁকে না), জমি-চোর ভুয়ো কোম্পানি সম্বন্ধে উত্তর ২৪ পরগণা জেলার এডিএমের চিঠি, জমির দানপত্র, ভূতাত্ত্বিক গবেষণামূলক গ্রন্থের উল্লেখ, রাজারহাট জমি বাঁচাও কমিটির পুস্তিকা থেকে সংগৃহীত তথ্য এমনকি ফরাসি সমাজতাত্ত্বিক Marcel Mauss এর ধ্রুপদী গ্রন্থ *The Gift* এর নির্যাস পর্যন্ত। সমাজতাত্ত্বিক তথ্য রাঘব ব্যবহার করেছেন তাঁর অনায়াস স্বভাবসিদ্ধ গভীরতা অনুসন্ধানকারী পড়ুয়ার ভঙ্গিতে, কখনই পণ্ডিতি দেখান নি।

বইটির আর একটি চমৎকার এবং আকর্ষণীয় দিক হলো এর চরিত্রগুলি। একদিকে উপকথাসম সাধারণ গ্রামীণ কয়েকজন মহিলা আর তারই উল্টোপিঠে চৌকস, স্মার্ট শহুরে মহিলা জার্নালিস্ট, আর এদের মাঝে বিগত জমানার ততোধিক চতুর জমি ডাকাতদের নেতা যার জীবনী লিখতে চায় ওই জার্নালিস্ট। চরিত্রগুলো অসম্ভব গতিশীল কখন কি করে বসে বোঝা যায় না। শেষ পর্যন্ত কি করে বসবে সেটা বোঝা আরও মুশকিল। আর সে

□ *অপারেশন রাজারহাট*।
রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়।
প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি, ২০১৩।
প্রকাশক : ভবানী বুক্স,গুয়াহাটি, আসাম।
দাম : ৩০০ টাকা।

কারণেই *অপারেশন রাজারহাট* পাঠককে টেনে নিয়ে চলে শেষ পর্যন্ত। রাঘব অবশ্য কাহিনি ও চরিত্রগুলির ছুটে চলার তোড়ে আমাদের ভাসালেও নিজে পাকা সাঁতারুর মতো পাশে পাশে থেকেছেন সারাক্ষণ। কখনও পাঠক হননি। শোনা যাক লেখকের ভাষায় :

> *অপারেশন রাজারহাট* মনুষ্যসৃষ্ট সময়ের আখ্যান, যে আখ্যানটি খুব নিষ্করুণ, আবার তাতে স্বপ্ন, দুঃস্বপ্নও জড়িয়ে থাকায় আশা এবং ত্রাস দুই-ই ছিল। ... পাঠক! আপনি স্বাগত এই দেশকালে, রাজারহাটের উন্নয়ন-উচ্ছেদ এবং আরও পাঁচ কথায়। এখানে কে কখন আপনার কানে কানে কোন কথা বলে যাবে তার কোনো আগাম নোটিশ থাকবে না।
>
> আনন্দের কথা, আপনি সবসময়ই কাউকে না কাউকে পেয়ে যাবেন, কেউ না কেউ কোথাও না কোথাও ভেবে চলেছে, বলে চলেছে, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে মেতে আছে জটিল ও বহুস্তর বিন্যস্ত এই বাস্তবতার, আবার এই মেগাসিটির সর্বৈব অবাস্তবতা, তার আলাদিন-মেজাজ, তার দখল, কর্তামি, লণ্ডভণ্ড করার ক্ষমতা যা দানব, যার খাবার হিসেবে গেরস্তদের জুগিয়ে যেতে হয়েছে একর একর সবুজ, ফলে তারা ছুটি বা মুক্তি পায়নি পুরাণকথা, পুরাণ-সময়ের হাত থেকে বরং শোকে নেশায়, পাওয়ায় এবং বঞ্চনায় দিশেহারা তারা যেন বা কড়া নেশায় আচ্ছন্ন, পাঠক আপনি সমাদৃত এখানেও।
>
> (পৃ. ১৮৮।)

এই অসাধারণ স্টাইলে লেখা প্রায় ৩০০ পাতার উপন্যাসটির পরতে পরতে কাহিনি, লেখক এক কথা বলতে গিয়ে পাঁচ কথা বলে গেছেন অবলীলায়, চরিত্রদের এনেছেন, খেলিয়ে দিয়েছেন আবার ইচ্ছেমতো তুলে নিয়ে তাদের জায়গায় অন্য কাউকে বসিয়ে দিয়েছেন। আমাদের মানে পাঠকদের কিছু যায় আসে নি। আমরাও অবলীলায় এগিয়ে গেছি এবং যাওয়ার পথে রাজারহাট নামক জায়গাটির মধ্যে কিভাবে কর্পোরেট পুঁজি রাজনীতির হাত ধরে (বরং বলা উচিত কান ধরে) রাজনৈতিক নেতাদের ওঠবোস করিয়ে তার আগ্রাসী ভূমিকায় এগিয়ে গেল এবং যাচ্ছে তার একটা অতি চমৎকার (নৃতাত্ত্বিক Clifford Geentz এর নকলে বলেই ফেলি thick description) বর্ণনা পেয়ে যাই রাঘবের মুনশিয়ানায়। এ যেন বর্ণনার বর্ণনা। অনেকগুলো কাহিনি তৈরি হচ্ছিল অনেকদিন ধরে। তারপর হঠাৎ একটা বিস্ফোরণ ঘটল। এরপর আর থামার উপায় থাকল না। পুঁজি এগিয়ে চলল, আরও পুঁজি সংগ্রহে। তৈরি হলো ননী সাহার মতো জমির দালাল যে এখন টাকার পাহাড়ে বসে জাতে উঠতে চায়, সুফি গানের আসর বসিয়ে জার্নালিস্ট মোহরকে নেমতন্ন করে বসে, আরও পাঁচজন জাতে ওঠা ভিআইপিদের সঙ্গে। উপন্যাসের একেবারে শেষ অংশে মোহর (জার্নালিস্ট) আর ননী (প্রোমোটার) শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানের সুফি গায়কদের গানে ডুবে যায়। সুফি গায়ক চোস্ত ইংরেজিতে ভালোবাসার বাণী শোনান। ননী জাতে ওঠে কিনা বোঝা যায় না। তবে সুফি গায়কদের ডেকে ঢালাও মদ আর ডিনারের ব্যবস্থার খরচ জোগান দেবার স্পনসরারদের যে অভাব ছিল না এটা গল্প করতে করতে রাঘব আমাদের শুনিয়ে রেখেছেন একটু আগেই। *অপারেশন রাজারহাট* এরকমই একটা স্মার্ট, আধুনিক নভেল, যা একইসঙ্গে স্থানীয় ও বিশ্বায়িত। তবে দুঃখ একটাই। এই নভেলের ইংরেজি অনুবাদ হওয়া অতি আবশ্যিক। তা না হলে ঘরের কোনায় পড়ে থাকার সম্ভাবনাই বেশি। বাঙালিদের বেশির ভাগ সিরিয়াস কাজকর্মের ভাগ্যে শেষ পর্যন্ত যা ঘটে। বাংলার বাইরে বেরতে পারে না চমৎকার সব চিন্তা। অমিতাভ ঘোষ বা অরুন্ধতী রায়ের বিশ্বায়িত হওয়ার ক্ষমতাটা ওই ঔপনিবেশিক ভাষা। রাঘবের বিষয় ও উপস্থাপনা অমিতাভ বা অরুন্ধতীর চেয়ে কোনো অংশে কম নয়, বাজি রেখে বলতে পারি। কিন্তু *অপনারেশন রাজারহাট* ইংরেজিতে অনুবাদ করার মতো অনুবাদক বাংলায় জুটবে কি? জুটলেও মোহর মার্কা হলে বিপদ। রাঘবই ভালো বলতে পারবেন এ বিষয়ে।

তবে শেষ করছি এই কথা বলে যে *অপারেশন রাজারহাট* এই সময়ের এক অসামান্য দলিল, এক অদ্ভুত thick description। সিরিয়াস পাঠকদের অবশ্য পাঠ্য।□

ফ্রিজের খাবার কত নিরাপদ

২০ পাতার পর

সতর্কতা যারা ফ্রিজ ব্যবহার করছেন তাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। যেমন :

১. রান্না করা এবং কাঁচা খাবার যাতে না মেশে তার জন্য সতর্ক থাকা;
২. ফ্রিজ বা ঠান্ডা ঘর থেকে বার করে আনা খাবার গরম করে খাওয়া;
৩. কাঁচা মাছ বা মাংস ফ্রিজ থেকে বার করে, তার থেকে বরফ গলে না যাওয়া পর্যন্ত রান্না না করা;
৪. মাছ, মাংস ইত্যাদি পরিমিত সেদ্ধ/ভাজা করা;
৫. ফ্রিজ বা ঠান্ডা ঘর থেকে বার করা খাবারের কিছুটা খেয়ে বাকিটা ফ্রিজে ঢোকানোর আগে সেটিকে আবার ভালো ভাবে গরম করে নেওয়া, নতুবা রান্না করার পর খাবারটি কয়েক ভাগে ভাগ করে প্রয়োজন অনুযায়ী এক একটি ভাগ খাওয়ার সময় বার করা, কারণ ফ্রিজের বাইরে বের করে এনে ঢালাঢালির সময় জীবাণুর সংক্রমণ ঘটতে পারে, তাছাড়া বাইরের তাপমাত্রায় জীবাণুর বংশবৃদ্ধি ঘটে;
৬. মাছ কিংবা বিশেষত মাংসের ক্ষেত্রে দেখা গেছে রান্নার প্রক্রিয়ায় অনেক সময় জীবাণুর স্পোর মরে না। আস্তে আস্তে ঠান্ডা করার সময় তার থেকে জীবাণু বংশবৃদ্ধি করতে পারে। সেক্ষেত্রে তা দ্রুত ঠাণ্ডা করে (এক-দেড় ঘণ্টার মধ্যে) ফ্রিজে ভরে দেওয়া যায়। কিন্তু ফ্রিজে গরম খাবার ভরা কখনই উচিত নয়— কারণ এতে ফ্রিজের ভেতরকার তাপমাত্রা বেড়ে যায় এবং খাদ্যে জলীয় পদার্থের পরিমাণও কিছুটা বৃদ্ধি পায়, ফলে জীবাণুর বংশবৃদ্ধির সুযোগ ঘটে। কাঁচা শাক সব্জি ফ্রিজে ঢোকানোর আগে সব সময়ই খুব ভালো ভাবে ধুয়ে নিতে হবে।

অনেকের মধ্যেই ভুল ধারণা রয়েছে, ফ্রিজে রান্না খাবার কয়েকদিন রেখে দিলে তার পুষ্টিমূল্য কমে যায় বা তা খেলে পেট গরম হয়। এই বিশ্বাসের মূলে কোনো বৈজ্ঞানিক সত্য নেই। অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের মূল উপাদান অর্থাৎ শর্করা, প্রোটিন কিংবা চর্বি জাতীয় পদার্থের খাদ্যমূল্য অবিকৃত থাকে। এবং এর ফলে অহেতুক জীবাণুর সংক্রমণ এবং তার থেকে পেট খারাপ, ডায়রিয়া ইত্যাদির সম্ভাবনা প্রায় শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনা যায়।□